B. P. Keshab

Sri Uddharan Gaudiya Math.

Chinsura P.O.

(Hooghly

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুকম্পিত
মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সঙ্কলিত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

কলিকাতা, বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ; বঙ্গাব্দ ১৩৪১, শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর

ভিক্ষা—এক টাকা।

ঢাকা, মনোমোহন প্রেসে

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

যাঁহার কৃপায় বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচারিত হইতেছে, তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা-দিবসে "শ্রীচৈতন্যদেব"-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তাহ-পারায়ণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনের কৃপা সম্বল করিয়া সাতদিনের মধ্যে এই গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণ-কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। সাধারণ ব্যক্তিগণও যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার দিগ্‌দর্শন পাইতে পারেন, সে-বিষয়ে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্রীমুরারিগুপ্তের সংস্কৃত কড়চা, শ্রীলোচন-দাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক', শ্রীল রূপ ও শ্রীল রঘুনাথের 'স্তবমালা' ও 'স্তবাবলী', শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্র' ও অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষভাবে মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 'গৌড়ীয় ভাষ্য', 'অনুভাষ্য', 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা', 'সজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত তথ্যসমূহ ও প্রবন্ধাবলী এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রুত সিদ্ধান্তবাণী "শ্রীচৈতন্যদেব"-গ্রন্থ রচনার মূল উপকরণ।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম শ্রেণী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, দ্বিতীয় শ্রেণী শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকে তাঁহাদের যথেচ্ছ চিন্তা ও ভাবধারার ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার (?) জন্য বা প্রতিকূল সমালোচনার জন্য এবং তৃতীয় শ্রেণী আত্মমঙ্গল ও আনুষঙ্গিকভাবে পর-মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্যচরিত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা যে মহাপুরুষের পাদপদ্ম হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাঁহার আদর্শ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে, অচৈতন্য-চিন্তাস্রোতে ও আচার-প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা করা যায় না। তাঁহার আদর্শ আমাদিগকে আরও জানাইয়াছে—শ্রীচৈতন্যের চরিত্র আলোচনা করিয়া প্রকৃত লাভবান হইতে হইলে বা শ্রীচৈতন্যকে বুঝিতে হইলে শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁ'র হয় প্রাণধন॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥ —চৈঃ চঃ অঃ ৫ পঃ

আধুনিক কালে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় মনীষী তাঁহাদের নিজ নিজ স্বাধীন-চিন্তার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের (?) পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'কামারের দোকানে দধি পাওয়া যায় না'—এ কথা প্রবাদের মধ্যে প্রচারিত থাকিলেও, আমরা অনেক সময়ই জাগতিক মনীষা ও প্রতিভার মনোহারী দোকানে পারমার্থিক সন্দেশ ক্রয় করিতে ধাবিত হই। সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষা, ভাবোচ্ছ্বাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, ইন্দ্রিয়গম্য ঐতিহাসিকতা বা প্রত্নতত্ত্ব ও মনোমুগ্ধকর কিংবদন্তী-সমূহ মেকী হইলেও আমাদের অনেকের হৃদয়ের উপরে যাদু বিস্তার করে।

বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যের বাণী পুনঃ-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "Sree Chaitanya Mahaprabhu and His Life and Precepts" নামক মহাপ্রভুর একখানি সংক্ষিপ্ত ইংরাজী চরিত্র-গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে (ইংরাজী ১৯৩৩ সালে) আমার পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতা কটক রেভেন্সা-কালেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় "Sree Krishna Chaitanya" নামক মহাপ্রভুর একখানি বিস্তৃত চরিত্র-গ্রন্থ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বাণীর অনুসরণে লিখিয়াছেন। মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্ম-শোধনের জন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'গ্রন্থের প্রকাশক আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের আদেশে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও তথাকার বিদ্বৎসমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করিতেছেন জার্ম্মাণ ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কএকটি প্রবন্ধ-সম্বলিত একটি গ্রন্থও কএক দিবস পূর্ব্বে বার্লিন গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় হইতে উক্ত স্বামীজী প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দদাস এম্-এ,

প্রত্নতত্ত্ববিশারদ লণ্ডনে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ একটী সন্দর্ভ লিখিতেছেন। আমাদের শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেরও অনুবাদ হইয়াছে এবং তামিল, তেলেগু, হিন্দি, আসামী, উৎকল প্রভৃতি ভাষায়ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ কৃতী সতীর্থ ভ্রাতৃগণ রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আত্মমঙ্গল বরণের জন্য পরমপূজ্যপাদ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুরও আমার প্রতি আদেশ আছে।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ সতীর্থ ভ্রাতা মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের একটী সংক্ষিপ্ত চরিত-গ্রন্থ লিখিবার জন্য কএকদিবস পূর্ব্বে আমাকে অনুরোধ করেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষায় এম্-এ, পরীক্ষার্থী কএকজন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-দেবের বিবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের নিকট আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-দেবের একখানি নির্ভরযোগ্য চরিত্রগ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। শ্রীগুরুদেবের মঙ্গলময় আদেশে ও ইঁহাদের অনুরোধে আমি ঐরূপ গুরুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। সংস্কৃতাধ্যাপক মহাশয় এই গ্রন্থের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারই আগ্রহে ও উৎসাহে ময়মনসিংহ-সহর-নিবাসী আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাসাধিকারী মহাশয় এই গ্রন্থের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাভাজন ও সজ্জনগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক দিবারাত্র যে কিরূপ পরিশ্রম করিয়া প্রুফ্ সংশোধন ও এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উদ্যম-উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনার ভাষা আমার নাই।

এ বৎসর শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের পূজিত শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তথায় শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননের সময় ভূগর্ভ হইতে স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছেন। সেই শ্রীবিগ্রহের আলেখ্য এই গ্রন্থে যথাস্থানে সংযুক্ত হইল।

লণ্ডনের 'বৃটিশ মিউজিয়ম্ ও য়্যাড্মির্যালৃটী'-ভবনে সংরক্ষিত দুইটী মানচিত্র

জলঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ-শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সাক্ষ্য অবিসংবাদিতভাবে প্রদান করিতেছে। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সি দি রাইট্ অনারেবল্ স্যর জন্ এণ্ডারসন্ গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৫) যখন শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন গভর্ণর-বাহাদুরকে ঐ মানচিত্র দুইটী প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে ঐ মানচিত্রদ্বয় সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়ায় ব্লক্ করিয়া ঐ মানচিত্র এই সংস্করণে সংযুক্ত করিবার সময় হইল না।

শ্রদ্ধেয় সতীর্থ ভ্রাতা পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানে সম্প্রতি একটী অম্বরভেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই নবনির্ম্মিত মন্দিরে আজ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব হইবে। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষমসমরবিজয়ী পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয় অদ্যকার প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আজ গৌরজন্মস্থলীতে এই সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সম্মুখে লইয়া "শ্রীচৈতন্যদেব"-গ্রন্থ সজ্জনগণের নিকট প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
শ্রীগৌর-জন্মতিথি
গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌড়ীয়সেবা-সংরতজনগণ-কৃপাভিলাষী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীচৈতন্যদেব (শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যদেব

এক

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তাঁহার সমকালে সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল।

১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বাহ্‌লুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রথম পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তখন লোদীবংশের প্রবল প্রতাপ। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বাহ্‌লুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকন্দরের রাজত্বকালেই শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে তাঁহার বাল্য-লীলা, অধ্যাপনা-লীলা এবং পরে সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়া পুরী গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তিন বৎসর পর সিকন্দর-শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আটাশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাহার পর সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শুনা যায়, ইতঃপূর্ব্বেই মথুরার দেবমন্দির-সমূহ ধ্বংস-লীলার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব কখনও পুরীতে অবস্থান, কখনও বা দাক্ষিণাত্য, বঙ্গ ও ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে পরিব্রাজকরূপে নাম-প্রেম প্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানের শেষভাগে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় (১৫২৬ খৃষ্টাব্দের

২১শে এপ্রিল)। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন,তাহার শিখা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক-গগন পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। শুনা যায়, বাবরই প্রথমে বন্দুক ও কামানাদি নূতন অস্ত্ররূপে যুদ্ধে ব্যবহার করিয়া ইব্রাহিম লোদীকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন—(সৈফ্-উদ্দীন) ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৬—৮৯), তৎপরে (নাসির্-উদ্দীন) মহ্মুদ্ শাহ্ (১৪৮৯—৯০), তৎপরে মজঃফর শাহ্ (১৪৯০—৯৩), তৎপরে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩—১৫১৯), তৎপরে নছরৎ শাহ্ (১৫১৯-৩২), তৎপরে (আলাউদ্দীন্) ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২), তৎপরে (গিয়াস্উদ্দীন্) মহ্মুদ্ শাহ (১৫৩২-৩৮), তৎপরে হুমায়ুন।

উড়িষ্যায় সূর্য্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করেন। এই সময় বাঙ্গালার সুলতান হোসেন শাহের প্রবল প্রতাপ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় এগার বৎসর পরে প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরও প্রায় ছয় বৎসর উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সময়ে আসামদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন,—সুসেন ফা (১৪৩৯—৮৮), সুহেন ফা (১৪৮৮—৯৩), সুপিম্ ফা (১৪৯৩—৯৭), সুহুঙ্গ মুঙ্গ (১৪৯৭—১৫৩৯)।

প্রায় সেই সময়ে নেপালে নিম্নলিখিত রাজগণ রাজত্ব করেন—রায়মল্ল (১৪৯৫—৯৬), ভুবনমল্ল (—), জিতমল্ল (১৫২৪—৩৩) ও প্রাণমল্ল (১৫২৪—৩৩)।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—এই সময়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতাপমাণিক্য (?—১৪৯০), ধন্যমাণিক্য (১৪৯০—১৫২২), ধ্বজমাণিক্য (১৫২২), দেবমাণিক্য (১৫২২-৩৫), ইন্দ্রমাণিক্য (১৫৩৫), বিজয়মাণিক্য (১৫৩৫—৮৩)।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশ অরাজকতার রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৪১৪) রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহের বংশধরগণকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু পিতৃসিংহাসনে বসিবার পর মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং জলালউদ্দীন মহম্মদ-শাহ্ নামে পরিচিত হন। রাজ্যের ওম্রাহগণ তখন যদুর পুত্র আহম্মদ-শাহ্‌কে হত্যা করিয়া ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহার পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাব্‌শী-ক্রীতদাসগণ বঙ্গদেশে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান রুকনুউদ্দীন বার্‌বকশাহ্ আফ্রিকা হইতে হাব্‌শী খোজাগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইলিয়াস শাহের বংশ পুনরায় বঙ্গদেশে নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও নরহত্যার তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে রাজত্ব করেন। মুসলমান-নরপতিগণ অবরোধ রক্ষার জন্য হাব্‌শী ক্লীব ক্রীতদাসদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সময় সময় ক্রীতদাসগণ রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া পরে বিশ্বাসহন্তা ও প্রভুহন্তা হইয়া পড়িত। বঙ্গদেশে তখন কপটতা, ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, নরপতিহত্যা, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা যে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অরাজকতায় অস্থির হইয়া বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান আমীরগণ অবশেষে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌কে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এই হোসেন শাহের

সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ইহা আমরা যথাস্থানে বর্ণন করিব।

বাদশাহ্ হোসেন শাহ্ তদানীন্তন যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদের অধিবাসী ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীসনাতনকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী (১) করিয়া তাঁহাকে 'সাকরমল্লিক' এবং শ্রীরূপকে 'দবিরখাস' (Private Secretary) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। (২) সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হাজীপুরে (৩) বাদশাহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সনাতন ও রূপের কনিষ্ঠভ্রাতা বল্লভ (শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম শ্রীঅনুপম—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর পিতৃদেব) গৌড়ের টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। হোসেন শাহের উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানের অত্যাচার দেখিয়া দবিরখাস ও সাকরমল্লিক বিশেষ ব্যথিত হন। হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যার দেবমন্দিরসমূহ নষ্ট করিয়াছিলেন। (৪) হোসেন শাহ্ তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (৫) হোসেন শাহের গুরু মৌলানা সিরাজুদ্দীন ওরফে চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নিমাইর প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনে বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের নিকটবর্ত্তী জনৈক নাগরিকের কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। (৬) কাজীর এলাকায় বাস করিয়া যদি কেহ হরিকীর্ত্তন করেন,

---

(১) চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩—২৩

(২) চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৭১ ও চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৫

(৩) চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৮

(৪) চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৬৭

(৫) চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৮০—১৮৬

(৬) চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৭৮

তবে তাঁহাকে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট করা হইবে—কাজী এই হুকুম জারি করেন। তখন প্রতাপরুদ্রের রাজ্য উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে বা বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় আসা-যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। পিছল্‌দা পর্য্যন্ত মুসলমান-রাজার অধিকার ছিল। স্থানে স্থানে শূল পাতিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহাতে এক রাজার প্রজা বা এক রাজ্যের লোক আর এক রাজার রাজ্যে যাইতে না পারে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থান-কালে ও তাঁহার অপ্রকটের প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ্ পরলোক গমন করেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাহ্‌মনি রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। বিজাপুর বিজয়নগরের সহিত বিবাদে রত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই যুগের বিবরণে পাওয়া যায়,—কেবল হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বীভৎস ইতিহাস।

মেবারের রাজপুত-রাজ্য—যাহা হিন্দুর শৌর্য্য, বীর্য্য, আভিজাত্য ও স্বাধীনতার উদয়গিরি বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সেখানেও শান্তি প্রবেশ করিতে যেন ভীত হইত। ১৪৩৩ হইতে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে মেবারের বিখ্যাত মহারাণা কুম্ভ মুসলমান সুলতানদিগকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের পুত্রের হস্তেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কুম্ভের পৌত্র 'সমরশতবিজয়ী' রাণা সংগ্রামসিংহ (১৫০৮—১৫২৭ খৃঃ) ভারতবর্ষকে মুসলমানগণের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চ আশা পোষণ করিতেছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে যখন বাবরের দ্বারা ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলেন, তখন রাণা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ নবাগত মোগলের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুত-প্রধানকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহার স্বপ্ন সফল করিবেন ; কিন্তু তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে

ফতেপুরসিক্রীর নিকট খানুয়ার-যুদ্ধে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—পার্থিব স্বাধীনতার স্বপ্ন চপলার ন্যায় চঞ্চল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে, দাক্ষিণাত্যে, কখনও বা বঙ্গে, কখনও বৃন্দাবনে পরা শান্তির উৎস নাম-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতেছিলেন।

দুই

বঙ্গের অর্থ-নৈতিক অবস্থা

অনেকের ধারণা, অর্থ থাকিলেই সব হয়—সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম, সকলের মূলই অর্থ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গের অর্থ-নৈতিক অবস্থা আমাদের এই ধারণাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যের প্রকটের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল। আফ্রিকার পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা মুহম্মদ তুগ্‌লকের আমলে (১৩২৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশের দ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তখন বর্ত্তমান কালের প্রতি মণ ধান্য দু' আনায়, ঘৃত প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, চিনি প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, তিল-তৈল প্রতি মণ সাড়ে এগার আনায়, পনর গজ উত্তম কাপড় দু' টাকায় ও একটি দুগ্ধবতী গাভী তিন টাকায় পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পরে নবাব শায়েস্তা খাঁর যুগেও আমরা এক টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় হইবার প্রবাদ এখনও উল্লেখ করিয়া থাকি। সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর সুলভ যুগ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সমকালে স্বপ্নের কথা ছিল না বটে, কিন্তু সেই সময়ের আর্থিক উন্নতাবস্থা নানাপ্রকারে বিপৎসঙ্কুল ছিল।

লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ দম্ভ ও প্রতিযোগিতা করিয়া পুতুলের বিবাহ, পালিত কুকুর-বিড়ালের বিবাহ, পুত্র-কন্যার বিবাহ বা মনসা-পূজা প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।* ব্যবহারিকতা ও লৌকিকতায়ই তাঁহাদের অর্থ নিযুক্ত হইত, কিন্তু লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টির মধ্যে বাস করিয়াও তাঁহারা লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন।

কেহ কেহ তখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অর্থরাশি প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু একদিকে রাজা, আর এক দিকে দস্যু-তস্করের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। অর্থ দূরে থাকুক, তখন ধর্ম্মপত্নীর সতীত্ব, আভিজাত্য ও সম্মান লইয়া নিরাপদে বাস করাও কঠিন হইয়াছিল। যথেচ্ছাচারী রাজার যথেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে ঐ সকল ধন, রত্ন, স্ত্রী, সম্মান যে-কোন সময়ে বলি দিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। ইতিহাসের বহু ঘটনা ও বিবরণ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

---

* রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
বার্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু-ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬২, ৬৫, ৬৬

তিন

বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সমকালে বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চার বিশেষ সমাদর ছিল। তখন বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ বিদ্যা ও সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপে ঘরে ঘরে পণ্ডিত ও পড়ুয়া ছাত্র বাস করিতেন। বালকও ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সর্ব্বদা বিচার-যুদ্ধে প্রতিযোগী হইত। ঘট-পটের বিচার লইয়া কালক্ষেপ করাই মহা গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য নানাদেশ হইতে লোক আসিতেন। নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত না করিলে কেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতেন না। নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ন্যায় প্রবীণ বৈয়াকরণ, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বা মুরারি গুপ্তের ন্যায় নৈয়ায়িক, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বৈদান্তিক এবং তৎপূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেবের ন্যায় কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সময়ের নবদ্বীপের একটি চিত্র বর্ণন করিয়াছেন,—

ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে ॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৫৮—৬১, ৬৮

শ্রীচৈতন্যের সময়ের লেখক কবি কর্ণপূরও এই সময়ের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূর-দূর-ভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ ॥

নৈয়ায়িক তার্কিকগণ জন্মকাল হইতে কেবল 'জাতি', 'অনুমিতি', 'উপাধি', 'ব্যাপ্তি', প্রভৃতি শব্দের আলাপ করিতেছেন, ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। যিনি যত অধিক কল্পনা-নিপুণ, তিনি তত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত। ইঁহারা কল্পনাকেই শাস্ত্র মনে করেন।

তদানীন্তন সাহিত্য-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিলে যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপালের গীত, মনসার গান, শীতলামঙ্গল-মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরির পাঁচালী, শিবের ছড়া, ডাকপুরুষ ও খনার বচন প্রভৃতি গ্রাম্য লৌকিক সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়; মহাভারত ও রামায়ণের সাহিত্যকেও নানাপ্রকার কল্পনা, তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাষ-দোষের তুলিকার সংযোগে মূল রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা হইতে পৃথক্ করিয়া লৌকিক-সাহিত্যের ন্যায়ই আমোদ-প্রমোদের উপযোগী করা হইয়াছিল। সুসাহিত্যের এইরূপ দুর্ভিক্ষের দিনে নব-বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাক্কালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর ন্যায় মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী গাহিয়া জয়দেব, গুণরাজ-খান্ প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য সাহিত্যিকগণ গৌরচন্দ্রের আগমনের গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইলেন। কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ—"শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত করেন। হোসেন শাহ্ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান্' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদকারীকে সাহিত্যচর্চ্চার জন্য পুরস্কৃত করিলেও শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৌড়ে রামকেলিতে গমন করিয়াছিলেন, তখনই শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। *

চার

সামাজিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তাঁহার সমসাময়িক কালে সমাজের মেরুদণ্ড বর্ণাশ্রমের অবস্থা নানাভাবে পক্ষপাতগ্রস্ত হইয়াছিল। কবি-কর্ণপূর, ঠাকুর বৃন্দাবন ও কবিরাজ গোস্বামী এই সময়ের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সমাজের মধ্যে তখন কলির 'ভবিষ্য আচার' প্রবেশ করিয়াছে। সামাজিক ব্রাহ্মণগণ সূত্রমাত্র-চিহ্ন ধারণ করিয়া কেবলমাত্র দানগ্রহণ-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, ক্ষত্রিয়গণ

---

* রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহঁা নাহিক সংশয়॥
—চৈঃ চঃ মঃ ১।১৮০

প্রজারক্ষায় অসমর্থ হইয়া কেবল 'রাজা' উপাধিমাত্র সম্বল করিয়াছেন। বৈশ্যগণ বৌদ্ধ বা নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন, শূদ্রগণ ব্রহ্মবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

চারি বর্ণের ন্যায় চারি আশ্রমেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহে অক্ষম হইয়াই লোকে "ব্রহ্মচারী" অভিমান করিতেছে, গৃহস্থগণ অন্যান্য আশ্রমীর প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হইয়া নানাপ্রকার পাপের সহিত স্ত্রী-পুত্রাদির উদর-ভরণে ব্যস্ত আছে। 'বানপ্রস্থ' শব্দটী কেবল নামে-মাত্র শুনা যাইতেছে, কাহাকেও বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে না। আর সন্ন্যাসীর অভিমান করিয়া কতকগুলি লোক বেষের কেবল অপব্যবহার করিতেছে—তাহাকে জীবিকার্জ্জনের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। কেবল পরস্পর বিদ্যাকুলের বড়াই, বিষয়-সুখের প্রতিযোগিতা, মদ্যমাংস-দ্বারা অবৈদিক দেবতাগণের পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া সামাজিকগণের নিকট অভিনন্দিত হইতেছে। হরিনদী-গ্রামের 'দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ' (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৬৭), গোপাল চক্রবর্ত্তী (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮৮), ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান্ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০১) প্রভৃতি তদানীন্তন সমাজ-নায়কের চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন ও কবিরাজ গোস্বামী তদানীন্তন বহির্ম্মুখ বর্ণাশ্রম ও সমাজের অবস্থা দেখাইয়াছেন।

যখন নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজের ঘরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, তখন তাহা সামাজিকগণের অসহ্য হইত,—

'কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন ?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন ?'
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।

নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে,—'হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥'
কেহ বলে,—'এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥
এ বামুনে ঘুঁচাইলে গ্রামের মঙ্গল !
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥'
—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১০৯—১১৫

তদানীন্তন সমাজ উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী ছিল। হরিকীর্ত্তনকারী পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ স্মার্ত্ত-সমাজের উপহাস ও নির্য্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন,—

সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন ॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥
আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বল্গিয়াই মরে ॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫২—২৫৫

সমাজ তখন উচ্চহরিকীর্ত্তনকারী বিশ্ববন্ধুগণকে বিশ্ববৈরী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিত। কোন কোন সামাজিক ভক্তগণের উচ্চকীর্ত্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেন,—

'এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা' হৈতে হ'বে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ?
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে দ্বিধা নাই॥'
কেহ বলে'—'যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥'

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫৬—২৬০

হরিকীর্ত্তন তখন সর্ব্বক্ষণের কৃত্য বলিয়া গণিত হইত না। কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যবহারিক গতানুগতিক রীতিতে কোন কোন স্থানে হরিকীর্ত্তন অন্যান্য কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইত,—

কেহ বলে,—'একাদশী-নিশি-জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ' ?
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৬১—২৬২

সেই কালের সামাজিকগণ উচ্চকীর্ত্তন ও নৃত্যকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধতের ন্যায় হরিকীর্ত্তনে নৃত্য ও অকৃত্রিম ভাব একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত,—

শুনিলেই কীর্ত্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে,—'সব পেট পুষিবার আশ॥'

কেহ বলে,—'জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—কোন্ ব্যভার ?'
কেহ বলে,—'কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব,— হেন না দেখিলুঁ পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া॥
ধীরে-ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে ?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে, কি হয়ে ?'

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।৫৩—৫৭

নদীয়ার লোকসকল অনেক সময় উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন,—

'আমি—ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ'॥
সংসারী-সকল বলে,—'মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে'।
'এগুলার ঘর-দ্বার। ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩। ১১—১৩

সমাজ ধন-পুত্র-বিস্তারসে মত্ত ছিল। পারমার্থিক-বৈষ্ণব দেখিলেই সামাজিকগণ নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক ছড়া আবৃত্তি করিতেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করিতেন যে, দুনিয়ার লোকের ন্যায় যতি, তপস্বীও দু'দিন পরে মরিয়া যাইবে, অতএব সংসারে ভোগ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহারা দোলা ও গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িতে পারেন, যাঁহাদের আগে-পাছে দশ বিশ জন লোক গমন করে, তাঁহারাই মহাপুণ্যবান্ ও ধার্ম্মিক। যে ধর্ম্মের আচরণে দারিদ্র্য-দুঃখ ও দেশের দুর্ভিক্ষ বিদূরিত না হয়, দেশের ও দশের সুখ-সুবিধা না হয়, তাহা

ধর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নহে, উচ্চকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের শান্তি ভঙ্গ হয়, কাজেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগতে দুর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার অসুবিধা প্রেরণ করিয়া থাকেন, এইরূপ বিচার সামাজিকগণ পোষণ করিতেন,—

জগৎ প্রমত্ত—ধন-পুত্র-বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব-মাত্র সবে উপহাসে'॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া॥
তারে বলি 'সুকৃতি'—যে দোলা, ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যা'র আগে-পাছে রড়ে॥
এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন!
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৭—২১

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরেও নবদ্বীপের হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম্মবিরোধী কাজীর নিকট নিমাইর উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে গিয়াছিলেন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়া অভিনব উচ্চকীর্ত্তন প্রচার করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দিতেছেন, নাগরিকগণকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন, হরিকীর্ত্তনের দ্বারা রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন ও নানাভাবে শান্তিভঙ্গ করিতেছেন, ইহা হিন্দু-সামাজিকগণ কাজীর নিকট জানাইয়া নিমাইকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যুক্তি দিয়াছিলেন,—

* * *

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল॥
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি' জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥
নাগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭। ২০৩—২১৩

পাঁচ

ধর্ম্মজগতের অবস্থা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পারমার্থিক-ধর্ম্মজগতের অবস্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যবহারই পরমার্থের স্থান অধিকার করিয়া সমাজকে কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করাইবার জন্য প্রলুব্ধ

করিয়াছিল। তখন ভারতের অন্যান্য স্থানে যে কিছু পারমার্থিক-ধর্ম্মের আলোচনা ছিল, তাহাও প্রবল অসদ্ধর্ম্মের মতবাদসমূহের সহিত সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শুদ্ধতা সংরক্ষণে অসমর্থ ও ক্ষীণজীবী হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পরে রামানন্দি-শাখায় প্রবাহিত হইলে তাহাতে অলক্ষিতভাবে 'মায়াবাদ' প্রবেশ করিয়াছিল ; এমন কি, পরবর্ত্তিকালের রামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার-প্রচারের মধ্যেও স্মার্ত্ত-আচারের ন্যূনাধিক আদর ও পারমার্থিকগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ন্যূনাধিক লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারক দেবতনু শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে কতকটা বিদ্ধাদ্বৈতবাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারের বিজয়স্তম্ভ-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত-নামক বেদান্তভাষ্য কালক্রমে কেবলাদ্বৈতবাদের ভাষ্যগ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধর ও লক্ষ্মীধরকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও তত্ত্ববাদি-শাখায় কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল।

কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে" শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মজগতের অবস্থা অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়া, তৎকালে পারমার্থিক-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কিরূপ ধর্ম্মধ্বজিতা ও কপটবৈরাগ্য-সমূহ ধর্ম্মের পোষাক গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছেন,—

"জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রজসুধা-স্যন্দাধ্বরোধে মহ-
দ্দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ।

অম্ভোপাতনদীতটস্থ কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূদহো
জ্ঞাতং পানীয়াহরণপ্রবৃত্ততরুণীশঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ ॥
তদিদমুদর-ভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য ॥”

এই ব্যক্তি নদীতীরে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বদ্ধাসনে ধ্যান ও কুম্ভক করিয়া যোগনৈপুণ্য দেখাইতেছেন, কিন্তু হঠাৎ ইঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল কেন? অহো! বুঝিলাম, জলাহরণে আগতা কোন তরুণীর শঙ্খবলয়ের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যোগীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত। অতএব ঐ ব্যক্তির যোগক্রিয়ার প্রদর্শনী কেবল উদর-ভরণের অভিনয়।

তখন অনেকের তীর্থযাত্রার প্রতি আদর ছিল। কিন্তু ইহা অনেক সময়ই ভগবানের সেবা ও সাধুসঙ্গের উদ্দেশ্যে না হইয়া দেশ-ভ্রমণের সুখ ও দাম্ভিকতা প্রদর্শনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইত,—

“গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-
শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্।
অব্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্য্যট-
ন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশো বেত্তু কঃ ॥”

“আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, কাশী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গম, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রবাসাদি তীর্থ-সমূহ প্রতিবৎসর তিন চা'র বার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্য্যন্ত কতশত বৎসর কাটাইলাম, আমাদের ন্যায় মহাপুরুষকে কে চিনিতে পারে?”

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রামানন্দ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।* তিনি সীতারামের উপাসনা প্রচার ও জমায়েৎ বা রামায়েৎ সম্প্রদায়

* নাভাদাসের হিন্দী 'ভক্তমালে'র টীকাকার 'বার্ত্তিকপ্রকাশে'র রচয়িতা ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসের কৃষ্ণাসপ্তমীতে রামানন্দের প্রয়াগে আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে,—রামানন্দ ১৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ফর্কুহর্ সাহেবের মতে,—রামানন্দ ১৪২৫ অথবা ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

সৃষ্টি করেন। তাঁহার মত রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব-বিচার-অনুসারে ভগবৎ-প্রসাদে ও ভগবানের সেবকের মধ্যে তিনি স্পর্শদোষ-বিচার ও জাতিবিচার-করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচারের মধ্যে চরমে জীবের ভগবানে লীন হইয়া যাইবার ন্যূনাধিক বিচার দেখিতে পাওয়া যায়।* ভাগবতধর্ম্মে বা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত মতে এইরূপ বিচার নাই।

শ্রীরামানন্দের বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে কবীর একজন। ইনি বস্ত্রবয়নকারী কোন মুসলমানের পুত্র ছিলেন। তিনিও চরমে জীবের ভগবানে লীন হইয়া যাইবার মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।† তাৎ-কালিক অবস্থা দেখিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর—এই মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন,—নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবীরের মতবাদের উপরই শিখ্-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।‡ তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম-মত হইতে কিছু কিছু নৈতিক উপদেশ গ্রহণ করিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে একটি রাজনৈতিক ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষ ও বিদ্বেষের দিনে নানকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বেই নানকের আবির্ভাব-কাল।

---

* অনেকে শ্রীরামানন্দকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈত-বাদী বলিবারই পক্ষপাতী। ফর্কুহর্ সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও এই মত

† আধুনিক রামানন্দিগণ দুইজন কবীরের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে,—নির্ব্বিশেষবাদী কবীর, কবীরপন্থীদলের প্রবর্ত্তক এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মূল-কবীর বা রাম-কবীরই রামানন্দের শিষ্য।

‡ শিখ্-শব্দের অর্থ—শিষ্য। নানক লাহোরের নিকটবর্ত্তী তালবন্দী গ্রামে (বর্ত্তমান নানাকানা) জন্মগ্রহণ করেন।

রামানন্দ ও কবীর উত্তরভারতে এবং নানক পাঞ্জাবে বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন। যে সময় সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক সমরানলে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিদ্বেষভাবকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে তদনুযায়ী ধর্ম্ম-মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু রামানন্দ, কবীর বা নানকের উদার ধর্ম্মের যাদুমন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা চিরস্থায়ী হয় নাই। শিখ্-সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ধর্ম্মকে তাঁহারা আর তখন গুপ্ত রাখিতে চাহিলেন না। অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখ্‌দিগকে বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা দিলেন। নবম গুরু তেগ্ বাহাদুর ধর্ম্মের জন্য শির দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহের শিক্ষায় শিখেরা দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে শিখ্‌দিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

যখন ভারতের অন্যান্য স্থানে রাজনৈতিক ধূমে ধর্ম্ম রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বঙ্গদেশের অবস্থাও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে পারে নাই। তখনকার ধর্ম্মের অবস্থার চিত্র ঠাকুর বৃন্দাবনের তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত দেখিতে পাই,—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকসবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ'-সবার মুখেহ নাহি হরিধ্বনি ॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ

ছয়

সমসাময়িক পৃথিবী

শুধু ভারতের নহে, তখনকার পৃথিবীর ইতিহাস—এক সঙ্ঘর্ষের যুগের ইতিহাস। তখন Wars of the Roses এবং পাশ্চাত্য মধ্য-যুগের অবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে। নানাপ্রকার পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সঙ্ঘর্ষে পাশ্চাত্যদেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ ন্যূনাধিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বর্ত্তমান যুগের সূচনা হইল; এইজন্যই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দকে **"The beginning of the modern age"**

বলিয়াছেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল। এই সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্য জগতেরও "Renascence." বা "নূতন জন্মের" সূচনা হইতেছিল।*

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ঠিক পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সরাসর জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য পাশ্চাত্যজাতির প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ (Bartholomew Diaz) নামক একজন নাবিক উত্তমাশা-অন্তরীপে পৌঁছিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষের জলপথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে আরও কএক জন নাবিক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-নাবিক ভাস্কোদা গামা কালিকট্ বন্দরে পৌঁছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ-লীলায় দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালক-মাত্র।

কে জানে—এই জলপথ আবিষ্কারের গৌণ উদ্দেশ্য অনেক কিছু থাকিলেও মুখ্য উদ্দেশ্য—নবদ্বীপ-সুধাকরের নাম-প্রেম-প্রচার-দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত যোগসূত্র রচনা—অন্তর্নিহিত ছিল কি না? পাশ্চাত্যের বণিক্ ভারতবর্ষের প্রবাদ-গাথার ধনরত্নে লাভবান্ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত—ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন পরমার্থের বাণী তাঁহাদিগকে অধিকতর লাভবান্ করিবে? তখন কে

* While Henry VII was struggling with his difficulties, a series of explorations had suddenly multiplied the area of the world, and opened new horizons. * * * Even more important than the discoveries as a sign of the coming of a new era was the Renascence which first began seriously to affect the life and thought of England in the time of Henry VII.

জানিত—ভারতের এই জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় একদিন শ্রীচৈতন্যের নামহট্টের ব্রাজকবিপণি ও প্রেমের পসরা লইয়া প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে বিশ্বমঙ্গল অভিযান হইবে ?

সপ্তম হেন্‌রীর সময়ে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে Renascence বা নবজাগরণের যুগে ইংলণ্ডের অক্স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্য-সাধনার নবভাবে বিভাবিত হইয়াছিল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেও ভারতের অক্স্‌ফোর্ড্‌ বা প্রধানতম সারস্বত-তীর্থ নবদ্বীপ পরাবিদ্যা, ভক্তিসাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পসাধনার এক নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যদেশে যখন 'Utopia' (No-where) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব-সমাজের কাল্পনিক চিত্র প্রচার করিতেছিল, তখন ও তৎপূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেব অনর্পিতচর পরমার্থের অনুসরণ-কারী আদর্শ সমাজের বাস্তব চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন লুথার † পোপের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্যজগতে খৃষ্টধর্ম্মে এক সংস্কারের যুগের উদ্বোধন করিলেন। এই সময় তদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতবর্ষে এই সময়ে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বাদ ও নানাপ্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ;

---

† * * * Thus a great part of Europe, including England was full of explosives only waiting for a spark ; the spark came from Martin Luther, a friar professor of Wittenberg in Saxony, who in 1517 nailed to the door of the church there a number of *Theses* challanging the right of the Pope to sell indulgences, or exemptions from penance. A fierce controversy arose which was swiftly spread by the new invention of the printing-press.

Ramsay Muir P. 163,173

তিনি মার্টিন লুথার বা **জগতের অন্যান্য ধর্ম্মসংস্কারকের ন্যায় সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করেন নাই।** কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ঐতিহাসিকগণ এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সংস্কারক' বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি সংস্কারক নহেন, তিনি সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক, **বিকাশক ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকের অভিনয় করিয়াও স্বয়ং বিকসিত সনাতন-ধর্ম্মের অধিদেবতা।** শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে, কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য গোস্বামিগণের সময়ে,কিংবা তৎপরবর্ত্তী যুগের শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দের সময়ে, কিংবা তাহারও পরবর্ত্তী যুগের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও বেদান্তভাষ্য-প্রণেতা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সময়ে বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। ভারতে ও বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচারিত হইবার পর বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার পুনঃ প্রচারক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রকে প্রচার-কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রালয় হইতে শ্রীচৈতন্যের অনেক শিক্ষাগ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্যদেশে নবযুগ ও সভ্য-সুশাসন-পদ্ধতির সূচনা করিয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সন্ধান প্রদান করিয়া, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে এক নূতন পৃথিবী আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পথ সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিয়া এবং তৎসঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার-দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নবজাগরণের অনুপ্রেরণা প্রদান-পূর্ব্বক অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত পারমার্থিক যোগসূত্র রচনার সন্ধান প্রদান করিয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যে বিশ্বস্নিগ্ধকারী চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।

সাত

নবদ্বীপ

কবিকর্ণপূরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক", ঠাকুর বৃন্দাবনের "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" ও কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায়, গঙ্গার পূর্ব্বকূলে এই নবদ্বীপ-নগর বিরাজিত। বহু পূর্ব্ব হইতেই এই নবদ্বীপ-নগরে সেন-রাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। তদানীন্তন ভারতের বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র সেই নবদ্বীপ-নগরী এবং তচ্চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহও—যেখানে যেখানে বিদ্যালোচনার কেন্দ্র ছিল, সমস্তই "নবদ্বীপ" নামে পরিচিত হইত। নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "নবদ্বীপ-পরিক্রমা"য় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

> নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
> পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একগ্রাম॥
> যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
> যদ্যপি অনেক তথা, হয় এক নাম॥

এই নবদ্বীপ-নগরেই যে সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল, উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ এখনও এই স্থানে "বল্লাল-দীঘী" নামে একটি বিস্তৃত দীঘী এবং উহার উত্তরদিকে 'বল্লাল-ঢিপি' বা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ একটি উচ্চভূমি অবস্থিত রহিয়াছে। মল্লদহ জিলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় ভূপতিগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্য-সিংহাসন এই নবদ্বীপ-নগরে আনিয়াছিলেন বলিয়া নবদ্বীপ-মণ্ডলকে 'গৌড়ভূমি'ও বলা হয়। সেনরাজগণের অধঃপতনের পর নবদ্বীপ মুসলমান-রাজের হস্তগত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮—১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দীন সৈয়দ হোসেন

শাহের নিয়োগমতে দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পরিচালনের জন্য ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজীর আসন এই নবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত ছিল। এখনও এই স্থানে চাঁদকাজীর সমাধি ও তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রাচীন নবদ্বীপের 'বেলপুখুরিয়া' পল্লীর স্থানগুলি কিয়দংশ বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এই বামন-পুকুরেই চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান।

শ্রীনবদ্বীপধাম গঙ্গা-বেষ্টিত ষোলক্রোশ পরিধির অন্তর্গত; তাহাতে নবধা-ভক্তির পীঠস্বরূপ 'অন্তঃ', 'সীমন্ত', 'মধ্য', 'গোদ্রুম', 'কোল', 'ঋতু', 'জহ্নু', 'মোদদ্রুম', ও 'রুদ্র'—এই নয়টী দ্বীপ বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর; এই স্থানেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের বাসগৃহ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

"ভক্তিরত্নাকরে" নরহরি ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

> নবদ্বীপ-মধ্যে 'মায়াপুর' নামে স্থান।
> যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' * পুস্তকে লিখিত আছে,—

> নদীয়ার নীচে গঙ্গা-নাম মিশ্রঘাট।
> *   *   *
> শ্রীবাস-অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
> প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে॥
> বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
> ভাঙ্গাচুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥ —১ম—২য় পৃঃ

---

* এই পুস্তকখানির তত্ত্বাংশ প্রামাণিক না হইলেও ভৌগোলিকাংশকে অনেকেই প্রামাণিক বলিয়া বিচার করেন।

বল্লাল দিঘী—দূরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির

*　　*　　*
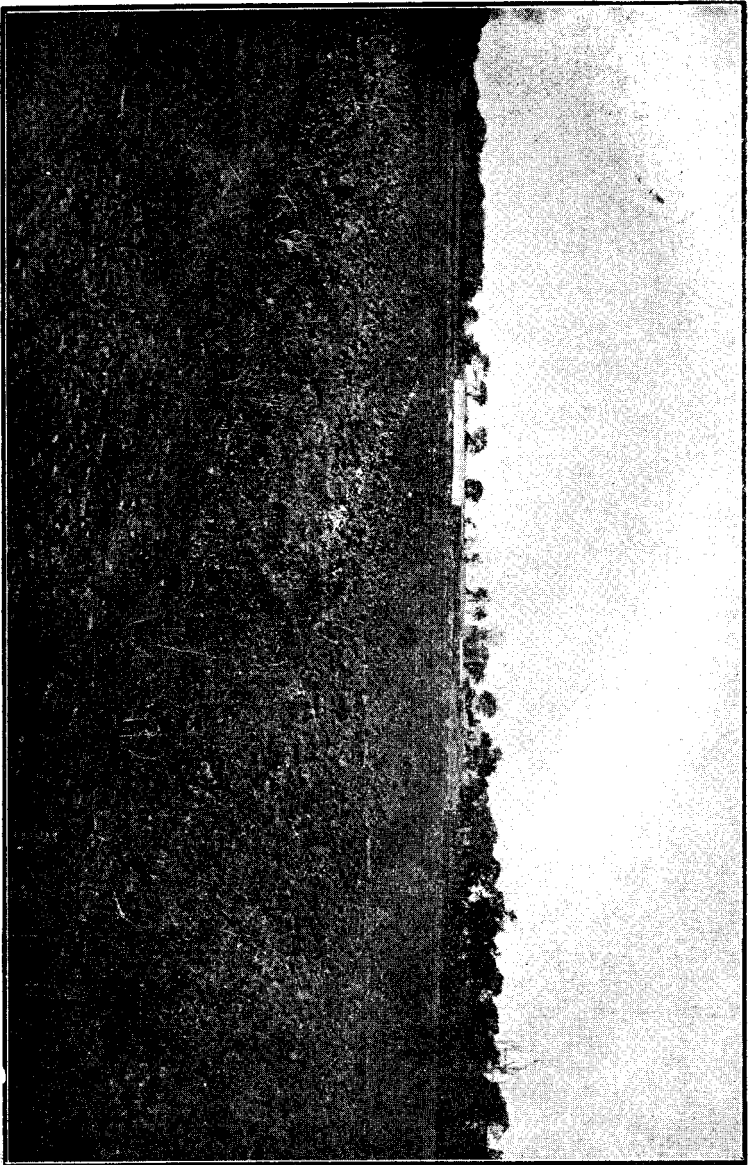
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর ॥　— ৪র্থ পৃঃ

আন্দুলের রাজা বাঙ্গালা ১২৫২ সালে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের ও বহু-স্থানের তদানীন্তন বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি ভাষপত্র-সম্বলিত "কায়স্থ-কৌস্তভ" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতেও দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেনরাজগণের রাজধানী মায়াপুর-নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়ায়াং এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম 'মায়াপুর'।" "মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ" ইতি উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রম্।
—কায়স্থকৌস্তভ ৯৮ পৃষ্ঠা।

"লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে রাজা হইলেন"। —১২৪ পৃষ্ঠা।

"নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম 'মায়াপুর'—শাস্ত্রে কহিয়াছেন।" —কায়স্থকৌস্তভ ১২৩ পৃষ্ঠা।

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ। শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে ॥"
অনন্তসংহিতা ৫৭ অধ্যায়।

—কায়স্থকৌস্তভ ১২৪ ও ১৩০ পৃষ্ঠা।

হাণ্টার সাহেব তাহার ইম্পিরিয়্যাল গেজেটীয়ার-এ লিখিয়াছেন,—

Nadia (Navadwip), ancient capital of Nadia District and the residence of Lakshan Sen. According to local legend the town was founded in 1063 A. D. by Lakshan Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya.

(Hunter's Imperial Gazetteer 1880).

আট

আবির্ভাব ও নামকরণ

শুনা যায়, মধুকর মিশ্র নামক এক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। মধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত ও সদ্‌গুণান্বিত উপেন্দ্র মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্রমিশ্রের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় 'পুরন্দর' উপাধি পাইয়াছিলেন। মিশ্র-পুরন্দর নবদ্বীপেই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠকন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ এবং গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব নিবাস ছিল—ফরিদপুর জেলার মগ্‌ডোবা-গ্রামে। ইনি গঙ্গাতীরে বাসের জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। কাজী-পাড়ায় ইনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করায় কাজীসাহেব প্রবীণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গ্রাম-সম্বন্ধে 'চাচা' ('খুড়া') বলিয়া ডাকিতেন। শচীদেবীর একে একে আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে বিশ্বরূপ-নামে নবম পুত্র-সন্তান আবির্ভূত হইলেন।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন, খৃষ্টীয় ১৪৮৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, নব-বসন্ত পূর্ণিমা—শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা—সন্ধ্যাকাল। পূর্ণচন্দ্র প্রতি বৎসরই এই সময় তাঁহার অমল-ধবল-স্নিগ্ধ অংশুমালায় বিশ্বকে স্নান করাইবার জন্য সগর্ব্বে উদিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আজ যেন চন্দ্রের পূর্ণতা, স্নিগ্ধতা, শুভ্রতা, উদারতা, বদান্যতা, কবিত্ব, সাহিত্য, ছন্দ—সমস্তই তিরস্কৃত।

ভূলোকের চন্দ্রের পূর্ণতা গোলোকের চন্দ্রের পূর্ণতার নিকট পরাভূত—বুঝি এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত* হইয়া পড়িল। বিশ্বের চতুর্দ্দিকে 'হরিবল', 'হরিবল' কলরব উঠিল—কর্ম্ম-কোলাহল স্তব্ধ হইল—দিগ্বধূগণ কৃষ্ণ কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া নাচিয়া হাসি উঠিল। এমন সময়ে সিংহলগ্নে, সিংহরাশিতে শচীগর্ভ-সিন্ধু হইতে মায়াপুর-পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন—অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল—মায়ামরুতে অমৃত-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। অবিরল ধারায় হরিকীর্ত্তন-সুধা-সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের হরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ঠাকুর হরিদাস আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দ-নৃত্য হইতে থাকিল॥ নরনারীগণ বিবিধ বিচিত্র উপহারের সহিত মিশ্রভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপ-চন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণ ও দেবগণ নরবেশে প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপ-চন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর ও পণ্ডিত শ্রীবাস মিশ্র-নন্দনের জাতকর্ম্ম-সংস্কার সমাধান করিলেন। জগন্নাথমিশ্র আনন্দ-ভরে সকলকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী সীতাঠাকুরাণী নবদ্বীপচন্দ্রকে দেখিবার জন্য শান্তিপুর হইতে মায়াপুরে শচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী ও চন্দ্রশেখর-পত্নীও অবিলম্বে বিবিধ উপায়নসহ শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া শচীনন্দনকে দর্শন করিলেন।

পাড়া-প্রতিবেশিগণ দিবারাত্রই বালককে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানাভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে

* সেইদিন পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।

নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইত না। তখন কেবলমাত্র কেহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলেই বালক নীরব হইত—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৯

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এই নবীন বালকে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে বিরাজিত। ইনি সমগ্র বিশ্ব নিত্যকাল ভরণ-পোষণ করিবেন জানিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তি-প্রবর তাঁহার হৃদয় হইতে এই বালকের **"বিশ্বম্ভর"** * নাম প্রকাশিত করিলেন। ললনাগণ বালকের গৌরকান্তি এবং 'হরিকীর্ত্তন' শ্রবণমাত্র বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও উল্লাস লক্ষ্য করিয়া বালককে **"গৌরহরি"** নামে প্রচার করিলেন। যমের নিকট তিক্তসূচক নিম্ব-শব্দ হইতে স্নেহময়ী শচীদেবী **"নিমাই"**‡ নাম রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন,—নিম্ববৃক্ষের নিম্নে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় শচীদেবী পুত্রকে আদর করিয়া 'নিমাই' নামে ডাকিতেন। নিমাই পরবর্ত্তিকালে 'গৌরসুন্দর', 'গৌরাঙ্গ', 'মহাপ্রভু' ও সন্ন্যাসের পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভৃতি বহু নামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

* সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার, এই ত' কারণ॥
—চৈঃ চঃ আঃ ১৪।১৯

‡ ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।
—চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১৬

নিমাইর জন্মকোষ্ঠী এইরূপ,—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

নয়

নিমাইর বাল্য-লীলা

অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র নবদ্বীপ-সুধাকর ক্রমে ক্রমে লোকলোচনে বৃদ্ধিলীলা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। নিমাইর নামকরণ-কালে জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের রুচি পরীক্ষার জন্য বালকের নিকট পুঁথি, খই, ধান, কড়ি, সোণা, রূপা প্রভৃতি অনেক কিছু দ্রব্য রাখিলেন। বালক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথিকে আলিঙ্গন করিলেন। শিশুকালেই নিমাই জগৎকে শিক্ষা দিলেন,—পার্থিব দ্রব্যজাত সমস্তই অনিত্য—শ্রীমদ্-ভাগবতই নিত্যবস্তু। জীবের শিশুকাল হইতে ভাগবতী কথায় রুচি হইলেই তাঁহারা পূর্ণ ধনবান্ হইতে পারেন। প্রহ্লাদও শিশুকালে তাঁহার সমবয়স্ক ও সমপাঠী বালকগণকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ক্রমে নিমাই 'হামাগুড়ি' দিতে শিখিলেন। একদিন হামাগুড়ি দিতে দিতে গৃহের এক স্থানে একটি সর্পকে দেখিতে পাইয়া বালক কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপরে শয়নপূর্ব্বক শেষ-শায়ীর লীলা প্রকট করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমময়ী শচীপ্রমুখ ললনাগণ ব্যস্ত হইয়া 'গরুড়', 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও বালকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সর্পরূপী অনন্ত সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

হামাগুড়ি দিয়াই নিমাই একাকী গৃহের বাহিরে গমন করিতেন, লোকে বালকের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বালককে সন্দেশ, কলা প্রভৃতি প্রদান করিতেন। বালক সেই সকল দ্রব্য হরিকীর্ত্তনকারিণী নবদ্বীপ-ললনাগণকে পারিতোষিক-প্রসাদ-স্বরূপ বিলাইয়া দিতেন। কখনও বা কোন প্রতিবেশী গৃহস্থের গৃহে গমন করিয়া গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে দধি, দুগ্ধ ও অন্নাদি ভক্ষণ করিতেন। কাহারও গৃহসামগ্রী ভগ্ন করিয়া সেই স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিতেন। কিন্তু বালকের মুখচন্দ্রদর্শন-মাত্রই সকলে তাঁহাদের ব্যথা ও অভিযোগ ভুলিয়া যাইতেন।

একদিন নিমাইর দেহে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার দেখিয়া দুইজন চোর ঐ সকল চুরি করিবার যুক্তি করিল। নিমাই যখন একাকী রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, তখন ঐ দুই চোর নিমাইকে খুব আদর করিয়া ও অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের ভাণ দেখাইয়া কোলে তুলিয়া লইল ও বালককে তাঁহার ঘরে লইয়া যাইতেছে বলিয়া কোন নির্জ্জন-স্থানে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। নিমাইর কোন্ অলঙ্কার কে চুরি করিবে, তাহা লইয়া চোর দুইটি পরস্পর অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকিল। বালক নিমাই এক চোরের কাঁধে চাপিয়া আর এক চোরের হাত হইতে সন্দেশ খাইতে থাকিলেন। কিন্তু নিমাইর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চোর দুইটি তাহাদের নিজের গন্তব্যপথ ভুলিয়া গেল এবং অবশেষে তাহাদের নিজের ঘর মনে করিয়া জগন্নাথমিশ্রের ঘরেই উপস্থিত হইল। নিমাইকে স্কন্ধ হইতে নামাইবা-মাত্রই নিমাই পিতার কোলে গিয়া উঠিলেন; চোর দুইটী তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কে কোথায় পলাইবে, সেই পথ খুঁজিতে লাগিল এবং একটি সামান্ত বালক তাহাদিগকে কিরূপ ভেল্কি দিয়াছে, তাহা পরস্পর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। বালক নিমাই চোরের স্কন্ধে চাপিয়া তাহাদেরও মঙ্গলবিধান করিলেন। চোর

দুইটি গৌরসুন্দরকে স্কন্ধে ধারণ ও সন্দেশ ভোজন করাইয়া অজ্ঞাতসারে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছিল।

একদিন শচীদেবী নিমাইকে ভোজনার্থ 'খই, সন্দেশ' প্রদান করিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলে বালক খই, সন্দেশের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ; শচী ইহা দেখিয়া বালকের মুখ হইতে মাটীগুলি কাড়িয়া লইলেন। শিশু নিমাই মাতাকে দার্শনিক উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—"খই, সন্দেশ, অন্ন প্রভৃতির সহিত মৃত্তিকার কোন ভেদ নাই ; কারণ, উহারা সকলই মৃত্তিকার বিকার। জীবের দেহ, জীবের খাদ্য—সমস্তই 'মাটী'।" শচী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"জগতের সকল জিনিষ মাটীর বিকার হইলেও মাটী ও উহার বিকারের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার আছে। মাটীর বিকার অন্ন ভক্ষণ করিলে দেহ পুষ্টি হয়, কিন্তু আবার মাটী ভক্ষণ করিলে দেহ অসুস্থ ও বিনষ্ট হয়। মাটীর বিকার ঘটের মধ্যে জল আনয়ন করা যায়, কিন্তু মাটীর 'পিণ্ডে' জল আনিতে গেলে সমস্ত জল উহার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে।" মাতার এই উত্তর শুনিয়া নিমাই আনন্দিত হইলেন এবং ইহা দ্বারা শুষ্কজ্ঞানবাদিগণের একদেশী বিচার পরিত্যাগ করিয়া সেবাধর্ম্মের সার্ব্ব-দেশিক অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার-গ্রহণই কর্ত্তব্য—এই শিক্ষা দিলেন।

একদিন জনৈক গোপালভক্ত তীর্থপর্য্যটক ব্রাহ্মণ শ্রীমায়াপুরে মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ জগন্নাথমিশ্র সেই বিপ্রকে রন্ধন-সামগ্রী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া ধ্যানে গোপালকে ভোগপ্রদান করিতে উদ্যত হইলে বালক নিমাই আসিয়া ব্রাহ্মণের সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। নিমাই যে অন্নের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণ মিশ্রের অনুরোধে দ্বিতীয়বার পাক করিলেন। সেই বারও বিপ্র ধ্যানে ভোগ-নিবেদন-কালে

সেইরূপ ঘটনাই ঘটিল। বিশ্বরূপের অনুরোধে তৈর্থিক বিপ্র তৃতীয়বার রন্ধন করিলেন। এবার বালককে বিশেষভাবে আবদ্ধ রাখা হইল; বালক নিদ্রিত থাকিবার অভিনয় দেখাইলেন। এদিকে রাত্রি অধিক হইয়াছিল। গৌরহরির ইচ্ছায় নিদ্রাদেবী সকলেরই নয়ন-কোণে অতিথি হইলে তাঁহারা সেই অতিথি নিদ্রাদেবীর সৎকারেই ব্যস্ত হইয়া তৈর্থিক-অতিথির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় তৈর্থিক-বিপ্র পুনরায় ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে নিমাই তৃতীয়বার হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিপ্রের নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিলে নিমাই বিপ্রের নিকট চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি আমার নিত্য সেবক; আমি যখন ব্রজে নন্দদুলালরূপে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম। তখন ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন এবং আপনাকে ধন্য মানিয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ-প্রসাদ সেবা করিলেন। প্রভু তৈর্থিক-বিপ্রকে এই গুপ্তলীলাটি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

দশ

নিমাইর বিদ্যারম্ভ ও চাঞ্চল্য

শ্রীজগন্নাথমিশ্র নিমাইর 'হাতে খড়ি', 'কর্ণবেধ' ও 'চূড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন। দৃষ্টিমাত্রই নিমাই সমস্ত অক্ষর লিখিয়া যাইতেন। দুই তিন দিনে সমস্ত ফলা ও বানান আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন এবং

'রাম,' 'কৃষ্ণ', 'মুরারি', 'মুকুন্দ', 'বনমালী' এই সকল কৃষ্ণ-নাম লিখিতে লাগিলেন। নিমাই যখন মধুর স্বরে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' উচ্চারণ করিতেন, তখন সকলের প্রাণ কাড়িয়া নিতেন। গৌর-গোপাল কখনও আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, কখনও বা চন্দ্র, তারাসমূহকে আনিয়া দিবার জন্য মাতা-পিতায় নিকট অতিশয় আব্দার করিতেন এবং ঐ সকল জিনিষ না পাইলে অত্যন্ত কাঁদিতে থাকিতেন। তখন হরিনাম ছাড়া বালককে অপর কিছুতেই শান্ত করা যাইত না।

শ্রীমায়াপুরে মিশ্রভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহ। কোনও এক একাদশী তিথিতে তাঁহাদের গৃহে ভগবানের ভোগ প্রস্তুত হইতে ছিল। নিমাই সেই নৈবেদ্য ভোজন করিবার ইচ্ছায় জগন্নাথমিশ্রকে হিরণ্য-জগদীশের গৃহে তাহা আনয়নের জন্য পাঠাইলেন। হিরণ্য-জগদীশ মিশ্রের মুখে বালকের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,— "অদ্য একাদশী, আর আমাদের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে— এই কথা শিশু কিরূপেই বা জানিল? অবশ্যই এ বালকে কোনও বৈষ্ণবী শক্তি আছে।" তাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া সেই নৈবেদ্য বালকের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর পক্ষে এত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু অন্তর্য্যামী নিমাই ভক্তের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিবার ও একাদশী-দিবসে একমাত্র ভগবান্ই ভোগ-গ্রহণের অধিকারী, তাহা লোকে জানাইবার জন্য ঐরূপ এক ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন।

নিমাইর চঞ্চলতা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। বয়স্যগণের সহিত পরিহাস, কলহ, মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নানের সময় তাঁহাদের সহিত জলকেলি ইত্যাদি নানাপ্রকার চঞ্চলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে নদীয়ার পুরুষগণ যেমন জগন্নাথমিশ্রের নিকট প্রত্যহই নিমাইর দুর্ব্ব্যবহারের

নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল, অপরদিকে বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শচীমাতার কর্ণগোচর করাইল। শচীদেবী সকলকে মিষ্টবাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথমিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রবের কথা শুনিয়া পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য মধ্যাহ্নকালে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে পারিয়াই অন্যপথে গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্যগণকে বলিয়া গেলেন যে, যদি মিশ্র আসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহারা মিশ্রকে "অদ্য নিমাঞি গঙ্গাস্নানে আসে নাই" বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া জগন্নাথমিশ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নিমাই অস্নাত অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে মসীবিন্দুলিপ্ত হইয়া বিরাজিত। মিশ্র বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। নিমাইকে অভি-যোগকারী ব্যক্তিগণের কথা জানাইলে নিমাই বলিলেন,—"আমি গঙ্গাস্নানে না গেলেও যখন তাঁহারা গঙ্গার ঘাটে আমার উপদ্রব-সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, তখন আমি সত্যসত্যই তাহাদের প্রতি উপদ্রব করিব।" এইরূপ চাতুরী করিয়া নিমাই পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। এদিকে শচী-জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এ অদ্ভুত বালক কে? এ কি নন্দ-দুলালই গুপ্তভাবে আমাদের গৃহে আসিয়াছেন।"

এগার

অদ্বৈতসভা—বিশ্বরূপের সন্ন্যাস

শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী ছিল। তিনি নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের উত্তরে কিছুদূরে একটি টোল খুলিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইস্থানে তিনি ভগবানের আবির্ভাবের

জন্য জল-তুলসী দিয়া নারায়ণের আরাধনা করিতেন এবং হুঙ্কার করিয়া ভগবানের নিকট সমস্ত জগতের বিমুখতার কথা জানাইতেন। এই স্থানে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া ভগবানের কথা আলোচনা করিতেন। ইহাই 'অদ্বৈতসভা'-নামে পরিচিত হইয়াছিল।

বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বগুণে গুণী ছিলেন। সমস্ত সংসার কেবল জাগতিক কথায় মত্ত এবং প্রায় সকলের হৃদয়েই ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের প্রতি ন্যূনাধিক বিমুখতার ভাব দেখিয়া, এমন কি, যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি পড়াইতেন, তাঁহাদেরও আন্তরিক হরিভক্তির অভাব দেখিয়া—তিনি আর লোক-মুখ দর্শন করিবেন না,—এইরূপ বিচার করিলেন এবং অন্তরে অন্তরে সংসার ত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়াই তিনি অদ্বৈত-সভায় আসিতেন এবং শাস্ত্র হইতে হরিভক্তির ব্যাখ্যা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতেন। ভোজনের বেলা অতিক্রান্ত দেখিয়া শচীদেবী প্রায়ই বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নিমাইকে অদ্বৈত-সভায় পাঠাইয়া দিতেন। নিমাইর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া সভাস্থ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর চিত্ত মুগ্ধ হইত। বিশ্বরূপ গৃহে আসিয়া ভগবৎ-প্রসাদ সম্মান করিয়াই আবার অদ্বৈত-সভায় চলিয়া যাইতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোন প্রকার গৃহ-কার্য্য করিতেন না; যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিতেন, ততক্ষণ ঠাকুর-ঘরেই অবস্থান করিতেন। মাতা-পিতা বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া **'শঙ্করারণ্য'**-নামে খ্যাত হইলেন।

বার

উপনয়ন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন

বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিবার পর নিমাইর চঞ্চলতা সঙ্কুচিত হইল। এবার তিনি পাঠে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিলেন।

জগন্নাথমিশ্র কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে মনোনিবেশের কথা শুনিয়াও অন্তরে উৎফুল্ল হইতে পারিলেন না; কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইল,—বিশ্বরূপ শাস্ত্র পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন; কি জানি, নিমাইও পাছে লেখাপড়া শিখিয়া অগ্রজেরই অনুসরণ করে। মিশ্র নিমাইর পাঠ বন্ধ করাইলেন, নিমাই আবার প্রবলবেগে ঔদ্ধত্য ও চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন নিমাই গৃহের বাহিরে বিষ্ণুর নৈবেদ্য-পাকের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা-লিপ্ত হাঁড়ীগুলির উপর গিয়া বসিয়া রহিলেন; শচীমাতা এই কথা জানিতে পারিয়া বালককে সেই অপবিত্রস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বালক নিমাই মাতাকে জানাইলেন,—বিদ্যাহীন ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি বিচার করিবে? আবার বলিলেন,—এই সকল ভাণ্ডে যখন বিষ্ণুর ভোগ রন্ধন হইয়াছে, তখন এই সকল ভাণ্ড কখনই অপবিত্র হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে ভগবান্ উপবেশন করেন, সেইস্থান সর্ব্বপুণ্যময়; সেখানে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠান হয়।

শুভমাসে, শুভদিনে, শুভক্ষণে গৌরসুন্দরের উপনয়ন হইল। অনন্তদেব যজ্ঞসূত্ররূপে গৌরসুন্দরের সেবা করিলেন। নিমাই বামন-

রূপে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই অধ্যয়ন করিতে গেলেন। গঙ্গাদাস তাঁহার সমস্ত ছাত্রগণের মধ্যে নিমাইকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ও বিচক্ষণ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। গঙ্গাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে মুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি যেসকল ছাত্র প্রধান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাপ্রকার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিয়া অপদস্থ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। গঙ্গার ঘাটে গিয়া নিমাই অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত কলহ করিতেন। সূত্র-ব্যাখ্যার সময় নিজে যাহা স্থাপন করিতেন তাহাই স্বয়ং খণ্ডন ও পুনঃ অতি সুন্দরভাবে স্থাপন করিয়া ছাত্রগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন।

গঙ্গা অনেকদিন যাবৎ যমুনার ভাগ্যবাঞ্ছা করিতেছিলেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু গৌরাঙ্গ গঙ্গার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে থাকিলেন। নিমাই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, যথাবিধি বিষ্ণুপূজা, তুলসীকে জলপ্রদান ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া গৃহের মধ্যে নির্জ্জন-স্থানে অধ্যয়ন ও সূত্রের টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। জগন্নাথমিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন এবং বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ নিজ পুত্রের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। তিনি ঐশ্বর্য্যহীন বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেন না যে, স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন জগন্নাথমিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—নিমাই নবীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনামে হাস্য, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই বিষ্ণুর সিংহাসনে উঠিয়া সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রমুখ, দেবতাগণ "জয় শচীনন্দন" বলিয়া চতুর্দ্দিকে

তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন ; কখনও বা নিমাই প্রতিনগরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, আর কোটি কোটি লোক নিমাইর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন; কখনও বা অপরূপ পরিব্রাজক-রূপে নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে মহারঙ্গে নীলাচলে গমন করিতেছেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথমিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। নিমাই নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিবেন—এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। শচীদেবী মিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"নিমাই যেরূপ লেখাপড়ায় নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।" কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধান হইল। দশরথের বিজয়ে (ভক্ত-বিরহে) রামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, মিশ্রের বিজয়েও নিমাই তদ্রূপ বিস্তর ক্রন্দন করিলেন। নিমাই শচীমাতাকে বহু সান্ত্বনা-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন ; বলিলেন,—"মা, আমি তোমাকে ব্রহ্মা-মহেশ্বরেরও সুদুর্ল্লভ বস্তু প্রদান করিব।"

একদিন নিমাই গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় শচীদেবীর নিকট গঙ্গাপূজার জন্য তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন প্রভৃতি উপায়ন চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে একটুকু অপেক্ষা করিতে বলায় নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহের যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন ; কেবলমাত্র জননীর গায় হাত তুলিলেন না। সমস্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর নিমাই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শচীদেবী গন্ধ-মাল্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিমাইর গঙ্গাপূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে বালকৃষ্ণের সমস্ত চঞ্চলতা সহ্য করিতেন, তদ্রূপ শচীদেবীও নবদ্বীপে নিমাইর সকল চপলতা সহ্য করিতে লাগিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভোজনাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। তখন শচীমাতা পুত্রকে বুঝাইয়া

বলিলেন,—"তুমি পিতৃহীন বালক, গৃহসামগ্রী এইরূপে নষ্ট করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? কাল কি খাইবে—এমন কোন সম্বল গৃহে নাই।" নিমাই জননীকে বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর কৃষ্ণই সকলের পালক। তাঁহার দাসের পক্ষে আহারের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।" ইহা বলিয়া নিমাই অধ্যয়নের জন্য বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া জননীর হাতে তুই তোলা স্বর্ণ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ এই সম্বল পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া তোমার ব্যয় নির্ব্বাহ কর।" শচীদেবী দেখিতে লাগিলেন—যখন গৃহে অর্থের অভাব হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে সুবর্ণ লইয়া আসেন। শচীদেবী ইহাতে ভীতা হইলেন—কি জানি পাছে কোন প্রমাদ ঘটে। দশ পাঁচ জনকে দেখাইয়া শচীদেবী সেই সুবর্ণখণ্ড-গুলিকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রাদি সংগ্রহ করিতেন।

নিমাই ব্রহ্মচারিবেশে কপালে ঊর্দ্ধতিলক অঙ্কিত করিয়া প্রত্যহ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িতে যাইতেন এবং ছাত্রগণের মধ্যে সূত্রের এইরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিতেন যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিমাইকে ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন প্রদান-পূর্ব্বক মধ্যস্থলে বসাইতেন। এই সময় স্নান, ভোজন, ভ্রমণ—সকল কার্য্যেই নিমাই শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যতীত আর কিছু করিতেন না।

প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়াই নিমাই ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় পড়িতে বসিতেন এবং শাস্ত্রের বিচার লইয়া বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিতেন। যে-সকল ছাত্র নিমাইর অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করিতেন, নিমাই তাঁহাদিগের পাঠের নানা দোষ দেখাইতেন। মুরারিগুপ্ত নিমাইর অনুগত হইয়া পাঠ করেন না দেখিয়া একদিন নিমাই মুরারিকে বলিলেন—"মুরারি, তুমি বৈদ্য, লতা-পাতা ঘাঁটাই তোমার সাজে, ব্যাকরণ-শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র; ইহাতে কফ, পিত্ত বা অজীর্ণ-

রোগের ব্যবস্থা নাই; তুমি নিজে নিজে ইহা কি বুঝিবে? যাও, গিয়া রোগীর চিকিৎসা কর।”

সময় সময় মুরারিগুপ্ত মৌন থাকিতেন; কখনও বা নিমাইর বাক্যের প্রতিবাদ করিতে যাইতেন। কিন্তু চরমে নিমাইর সহিত পারিয়া উঠিতেন না। তখন মনে মনে বুঝিতেন—নিমাই সাধারণ মনুষ্য নহেন, নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্ত্য পুরুষ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত এইরূপে পরাজিত হইয়া নিমাইর অনুগত হইয়া অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হন।

ষোলবৎসর-বয়স্ক যুবক নিমাইর শাস্ত্রে এইরূপ অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই তাঁহার একটি বিদ্যা-চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হয়-ব্যাখ্যা নয় করা, নয়-ব্যাখ্যা হয় করা এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত করা ও তাঁহাদিগকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করাই নিমাইর কার্য্য পড়িয়া গেল।

তের

নিমাইর প্রথম বিবাহ

নবদ্বীপে বল্লভাচার্য্য-নামে জনকতুল্য একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীও মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। বল্লভাচার্য্য কন্যাকে উপযুক্ত বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য চিন্তিত ছিলেন। একদিন লক্ষ্মী গঙ্গাস্নানে গমন করেন, দৈবক্রমে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে, তাঁহারা উভয়েই মনে মনে একে অন্যকে অঙ্গীকার করেন।

এদিকে সেই দিনই বনমালী আচার্য্য-নামক এক ঘটক যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই শচীদেবীর নিকট গমন করিয়া বল্লভাচার্য্যের কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শচীদেবী বলেন,—"আমার নিমাই পিতৃহীন বালক, আগে বাঁচিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করুক, পরে অন্য বিষয়ের ভাবনা করা যাইবে।" শচীর কথায় নিরাশ হইয়া বনমালী ঘটক চলিয়া আসেন। দৈবাৎ পথে নিমাইর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঘটক মহাশয় নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু শচীদেবী সেই প্রস্তাব বিশেষ গ্রাহ্য করেন নাই—ঘটক মহাশয় নিমাইকে এই কথা জানাইলেন। নিমাই তখন গৃহে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিলেন,—"মা, তুমি আচার্য্যকে ভাল করিয়া সম্ভাষণ কর নাই কেন?" নিমাইর বনমালী-ঘটকের প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি আছে—এই ইঙ্গিত পাইয়া শচীদেবী তৎপর দিবস ঘটক মহাশয়কে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং শীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বনমালী আচার্য্যও বল্লভাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বল্লভচার্য্য তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন যে, তিনি অতি দরিদ্র, পাঁচটী হরিতকীমাত্র দিয়া জগন্নাথ-মিশ্রের পুত্ররত্নের হস্তে তাঁহার কন্যা প্রদান করিবেন। জামাতাকে তাঁহার অন্য কিছু যৌতুক প্রদানের ক্ষমতা নাই।

বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতিক্রমে শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্ব্বদিন নিমাইর অধিবাস-ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। পরদিবস শুভ গোধূলি-লগ্নে যাত্রা করিয়া নিমাই পণ্ডিত বল্লভাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন ও যথাবিধি লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে নিমাই লক্ষ্মীর সহিত দোলায় চড়িয়া নিজ

গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শচীমাতা মহালক্ষ্মী পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। সেই সময় হইতে শচীদেবী নিজ-গৃহে অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কখনও ঘরের বাহিরে পরম অদ্ভুত জ্যোতিঃ, কখনও নিমাইর পাশে অগ্নিশিখা দর্শন, কখনও বা পদ্মের গন্ধ ঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। নিমাই ও লক্ষ্মী নিশ্চয়ই মনুষ্য নহেন,—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে লক্ষ্মী-গৌরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ—শচীদেবীর অন্তরে সময়ে সময়ে এইরূপ ধারণা হইত।

চৌদ্দ

আত্ম-প্রকাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী

নিমাই পণ্ডিত অধ্যয়ন-রসে মত্ত হইয়া ছাত্রগণের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। এক গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে অন্য কোন পণ্ডিতই নিমাইর ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন না। নদীয়ার নাগরিকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তি-অনুসারে নিমাইকে নানা-রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড-প্রকৃতির লোকগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম, রমণীগণ মদন ও পণ্ডিতগণ বৃহস্পতিরূপে অনুভব করিলেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিহীন জগতে কবে আবার বিষ্ণুভক্তি প্রকাশিত হইবে, সেই আশায় কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে বিদ্যালাভের জন্য সকল দেশ হইতেই লোক আগমন করিতেন। চট্টগ্রামবাসী অনেক বৈষ্ণব সেই সময় গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। অপরাহ্ন-কালে ভাগবতগণ সকলেই অদ্বৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। মুকুন্দ-দত্তের হরিকীর্ত্তনে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ ছুটিত। নিমাইও তজ্জন্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। মুকুন্দকে

দেখিলেই নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া প্রেমের দ্বন্দ্ব চলিত। শ্রীবাসাদি বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তগণকেও নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। নিমাইর ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। এদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও ন্যায়ের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মুকুন্দও গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিলেন। নিমাইকে দেখিয়াই মুকুন্দ লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিমাই মুকুন্দের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গী গোবিন্দের নিকট বলিলেন,— "বুঝিয়াছি, মুকুন্দ কেন পলাইতেছে। মুকুন্দ মনে করে যে, আমার সহিত দেখা হইলে তাঁহার বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সম্ভাষণ হইয়া যাইবে! মুকুন্দ মনে করে, সে নিজে বৈষ্ণবের শাস্ত্র পাঠ করে, আর আমি পাঁজি, বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি জাগতিক শাস্ত্র পাঠ করি! আর বেশীদিন নয়, শীঘ্রই সে দেখিতে পাইবে,—আমি কত বড় বৈষ্ণব হই! আমি পৃথিবীর মধ্যে এত বড় বৈষ্ণব হইব যে, ব্রহ্মা-শিবাদি বৈষ্ণবগণ আমার দুয়ারে গড়াগড়ি যাইবে। যাহারা এখন আমাকে দেখিয়া পলাইতেছে, তাহারাই কোটি কণ্ঠে আমার গুণ গান করিবে।"

পনর

নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী

শ্রীচৈতন্য যাঁহাকে 'ভক্তিরসের আদিসূত্রধার' (চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬০) ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু যাঁহাকে ভক্তিরসকল্পতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' (চৈঃ চঃ আঃ ৯।১০ ও অঃ ৮।৩৪ পরিচ্ছেদ) বলিয়াছেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব গুরু। ইঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ-পুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়,' শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের 'প্রমেয়-রত্নাবলীতে, গোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে ও 'ভক্তিরত্নাকরে' মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠাকুর বৃন্দাবনের বিচারে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে বার বৎসর বয়সে নিত্যানন্দ ভারতের সমগ্র তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন এবং আট বৎসরকাল এই তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য—ঈশ্বরপুরী। ইনি হালিসহরের নিকট-বর্ত্তী কুমারহট্টে ব্রাহ্মণ-বংশে উদ্ভূত হন।

নিমাই পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মগ্ন আছেন, তখন একদিন প্রচ্ছন্নবেশে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া 'অদ্বৈত-সভায়' উঠিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরপুরীর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ তখন অদ্বৈত-সভায় একটি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে ঈশ্বরপুরীর অঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরপুরী বলিয়া জানিতে পারিলেন।

একদিন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। ঈশ্বরপুরী নিমাইর অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞসা করিলেন। নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং মহা সমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। শচীমাতা কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া

ঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষা করাইলেন। নিমাইর সহিত **কৃষ্ণপ্রসঙ্গ** বলিতে বলিতে ঈশ্বরপুরী প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে ঈশ্বরপুরী কএকমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই পরম বিরক্ত গদাধর পণ্ডিতের প্রেমের লক্ষণসমূহ দেখিয়া ঈশ্বরপুরী গদাধরের প্রতি বড়ই স্নেহযুক্ত হইলেন এবং গদাধরকে পুরীপাদ তাঁহার স্ব-রচিত **"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত"** পুঁথি পড়াইলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করিবার জন্য গোপীনাথের গৃহে যাইতেন। একদিন ঈশ্বরপুরী নিমাই পণ্ডিতকে "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" পুঁথির রচনায় কোথায়ও কোন দোষ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"যে গ্রন্থ সদ্‌গুরুপদাশ্রিত একান্ত ভগবদ্ভক্তের রচিত, তাহাতে কোন দোষ-থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি তাহাতে দোষ দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই অপরাধী ও মূর্খ। একান্ত শুদ্ধভক্তের কবিত্ব যে-কোনরূপই হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার দোষ ভাবগ্রাহী ভক্তিবশ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। এমন কোন্ দুঃসাহসী ব্যক্তি আছে যে, ঈশ্বরপুরীর ন্যায় একান্ত শুদ্ধভক্তের ভগবৎকথা-বর্ণনের মধ্যে দোষ ধরিতে সমর্থ হইবে" ?

তথাপি ঈশ্বরপুরী স্বীয় গ্রন্থের সমালোচনার জন্য নিমাইকে প্রত্যহই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত প্রত্যহ দুই চারিদণ্ড নানাপ্রকার বিচার করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত রঙ্গচ্ছলে জানাইলেন যে, ঐ শ্লোকস্থিত ধাতুটি 'আত্মনেপদী' না হইয়া 'পরস্মৈপদী' হইলেই ঠিক হয়। পরে আর একদিন নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট আসিলে

পুরীপাদ নিমাইকে কহিলেন,—"তুমি যে ধাতুটি আত্মনেপদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আত্মনেপদী-রূপেই সাধিয়াছি।" প্রভুও ভৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিমা-বর্দ্ধনের জন্য তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। ঈশ্বরপুরী ভারতের বিভিন্ন তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ষোল

নিমাইর নগর-ভ্রমণ

সশিষ্য নিমাই স্বরাট্ পুরুষের ন্যায় নগর ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের সহিত দৈবাৎ দেখা হইলে নিমাই মুকুন্দকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎসঙ্গে জানাইয়া দেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্য্যন্ত মুকুন্দের পরিত্রাণ নাই। মুকুন্দ মনে করিয়াছিলেন, নিমাইর কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে, তাই মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতকগুলি কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। মুকুন্দ নিমাইর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা ?
হেন শাস্ত্রে নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা !
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১৮

যাঁহারা মনে করেন, নিমাই কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পণ্ডিতমাত্র ছিলেন, মুকুন্দ তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিয়াছেন।

আর একদিন গদাধর পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। নিমাই গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর ন্যায়-শাস্ত্রের

সন ১৩৪১, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-
মায়াপুর যোগপীঠের নূতন নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের
ভিত্তি খননকালে এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও
তৎসহ কতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্র
পাওয়া গিয়াছে

সিদ্ধান্তানুযায়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট মুক্তির লক্ষণ
তাহাতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিলেন।
নাশই মুক্তির লক্ষণ”—গদাধরের এই উক্তি নিমাই

প্রত্যহ অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে বসিয়া নিমাই ছাত্র
ব্যাখ্যা করিতেন। বৈষ্ণবগণও নিমাইর শাস্ত্র ব্যাখ
হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন, নিমাই
ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি হইলেই সমস্ত সফল হইত। ভাগবতগণ
কৃষ্ণে রতি হউক”—অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা এইরূপ প্রার্থনা ক
কেহ বা প্রেমের স্বভাব-বশতঃ “নিমাইর কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক”
আশীর্ব্বাদও করিতেন। প্রেমের এমনই স্বভাব—তাহা প্রেমাস
ঐশ্বর্যময় প্রভুভাবে না দেখিয়া পাল্যভাবে দেখিয়া থাকে! নতুব
স্বয়ংকৃষ্ণ হইয়া জগতে একদিন কৃষ্ণভক্তের আদর্শ প্রকাশ কর
তাঁহাকেও “কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবা
কি? শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার ক
এবং ভক্তের আশীর্ব্বাদ-ফলেই যে কৃষ্ণভক্তি সম্ভব, তাহা সক
জানাইতেন। বিধর্ম্মিগণও নিমাইকে একবার দর্শন করিলে তাঁহার
প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

একবার নিমাই বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক বিকারসমূহ
প্রকাশ করিলেন। প্রেমস্বভাব বন্ধু-বান্ধবগণ নিমাইর মস্তকে নানাবিধ
পাকতৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নিমাই কোন কোন দিন
আস্ফালন ও হুঙ্কারের সহিত নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন।

নিমাই দ্বিপ্রহরে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় জলবিহার করিয়া গৃহে
আসিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা, তুলসীকে জল-প্রদান, তুলসী-পরিক্রমা
ও তৎপরে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। কিছুকাল

কৃপাকটাক্ষ করিয়া পুনরায় অধ্যয়নের জন্য গমন
। নাগরিকগণের সহিত সহাস্য-সম্ভাষণ ও বিবিধ
রিতেন।

ই তন্তুবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রযাচ্ঞা করিয়া
। গ্রহণ করিতেন। কোনদিন বা তিনি গোপ-গৃহে
গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতেন। গোপগণও
খা', 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্য করিয়া
প্রচুর দধি-দুগ্ধাদি প্রদান করিতেন। নিমাই উপহাসচ্ছলে
নিকট নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কোনও দিন বা গন্ধ-
গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্যগন্ধ, কোনও দিন বা মালাকার গৃহ
নাপ্রকার পুষ্পমাল্য এবং কোনও দিন বা তাম্বূলীর গৃহ হইতে
ল্যে তাম্বূলাদি গ্রহণ করিয়া নিমাই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন।
নিমাইর অনুপম রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনামূল্যেই তাঁহাকে
বস্তু প্রদান করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে
তন। কোনও দিন শঙ্খবণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্
রনারায়ণের হস্তে শঙ্খ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন; তৎপরিবর্ত্তে
কোন মূল্য চাহিতেন না।

একদিন নিমাই কোনও এক দৈবজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয়
পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ গোপাল-মন্ত্র জপ
করিয়া গণনা করিতে উদ্যত হইবা-মাত্র বিবিধ ঈশ্বরতত্ত্ব ও অদ্ভুত রূপ-
রাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অদ্ভুত অতিমর্ত্ত্য রূপ দেখিতে
দেখিতে দৈবজ্ঞ কখনও বা চক্ষু মেলিয়া সম্মুখস্থ শ্রীগৌরাঙ্গকে পুনঃ পুনঃ
ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের মায়ার প্রভাবে তাঁহাকে
বুঝিতে পারিলেন না; পরম বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,—বোধ হয়,

মহাপ্রভু ও খোলাবেচা শ্রীধর

কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন নিমাই খোলাবেচা ব্রাহ্মণ শ্রীধরের গৃহে গমন করিলেন। শ্রীধর লোকচক্ষে অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁহার পরিধানে শতছিদ্র বস্ত্র, তিনি জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করেন, ঘরে তৈজস-পত্র কিছুই নাই, সামান্ত লৌহ-পাত্রে জল পান করেন, থোড়-কলা-মোচা প্রভৃতি সামান্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পান, তাহা দ্বারাই অতি শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের সামান্ত নৈবেদ্য সংগ্রহ করেন।

নিমাই শ্রীধরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি লক্ষ্মীকান্তের সেবা কর, অথচ তোমার এই প্রকার দারিদ্র্য কেন? আর লোকে চণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া কত সাংসারিক উন্নতি করিতেছে।" উত্তরে শ্রীধর বলিলেন,—"রাজা রাজপ্রাসাদে বাস, উৎকৃষ্ট দ্রব্য-ভোজন ও দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষীগণ বৃক্ষের উপরে কুলায় বাঁধিয়া ও নানা স্থান হইতে আহৃত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ভোজন করিয়াও তদ্রূপ কাল কাটাইতেছে। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।" নিমাই বলিলেন,—"তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছ—দেখি কতদিন লুকাইয়া রাখিতে পার। শীঘ্রই লোকের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দিব।" নিমাই শ্রীধরের সহিত রহস্যচ্ছলে ভক্তের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন করিতেন এবং শ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনা মূল্যে থোড়-কলা-মূলা প্রভৃতি আদায় করিতেন।

একদিন নিমাইর আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া বৃন্দাবন-চন্দ্রের ভাবের উদ্দীপনা হইল ও সেইভাবে অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাত্র শচীমাতা ব্যতীত আর কেহই সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে

পাইলেন না। শচীদেবী ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—নিমাই বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শচীদেবী সেখানে আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না বটে; কিন্তু দেখিলেন,—পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ চন্দ্রমণ্ডল শোভা পাইতেছে।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত পথে নিমাইকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—"নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ না করিয়া কেন বৃথা কাল কাটাইতেছ? রাত্রিদিন পড়িয়া ও পড়াইয়া তোমার কি লাভ হইবে? লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়াশুনা করে, যদি সেই কৃষ্ণভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যায় কি লাভ? অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করিও না।" নিমাই নিজের ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি ভক্ত, তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।"

সতর

দিগ্বিজয়ি-জয়

যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপকগণের মুকুটমণি হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহা পণ্ডিত সকল দেশের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া পণ্ডিত-সমাজের প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে জয় করিতে আসিলেন। দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে ছিল—হস্তী, অশ্ব ও বহু শিষ্য। দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে আসিয়া পণ্ডিত-গণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ এক মহা দিগ্বিজয়ীর আগমনের সংবাদ পাইয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ নিমাইর নিকট

জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—"দর্পহারী ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প চিরদিনই হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই বিনীত। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি রাজগণ মহা দিগ্বিজয়ী বলিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ তাহাদের সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে নবাগত এই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্ই অচিরে চূর্ণ করিবেন।"

ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত সেই দিন সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে বসিয়া দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের কথা চিন্তা করিতেছিলেন সেই দিন ছিল—পূর্ণিমা-তিথি; নিশার প্রাক্কালেই দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া উপস্থিত। নিমাইর ছাত্রগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত-তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া দিগ্বিজয়ী নিমাইকে সম্ভাষণ করিলেন। নিমাই দিগ্বিজয়ীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আপনি কাব্যশাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত। যদি আপনি পাপনাশিনী গঙ্গার মহিমা বর্ণন করেন, তবে তাহা শুনিয়া সকলের পাপ-তাপ দূর হইতে পারে।" নিমাইর এই কথা শুনিবা-মাত্রই দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ যুগপৎ শত-মেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে গঙ্গা-মহিমাত্মক শ্লোক অতি দ্রুতবেগে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী এক প্রহরকাল ঐরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বিরত হইলে নিমাই ঐ স্তবের মধ্য হইতে একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া দিগ্বিজয়ীকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি এতক্ষণ ঝঞ্জাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গিয়াছি, আপনি কিরূপে তাহার মধ্য হইতে এই শ্লোকটি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন?"

নিমাই ঐ শ্লোকে দুই স্থানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ, বিরুদ্ধমতি-দোষ, পুনরুক্তি-দোষ ও ভগ্নক্রমদোষ—এক একটি করিয়া এই পাঁচটি দোষ দেখাইয়া বলিলেন,—পাঁচটি অলঙ্কারগুণ থাকা-সত্ত্বেও এই পাঁচটি দোষে দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের কবিত্ব 'ছারখার' হইয়াছে। দিগ্বিজয়ীর সমস্ত প্রতিভা তখন ম্লান হইয়া পড়িল। নিমাইর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে নিমাই তাহাতে বাধা দিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানা-ভাবে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পুনরায় পরদিন আসিতে বলিলেন।

দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ষড়্দর্শনের অসামান্য পণ্ডিতকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু আজ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শেষকালে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইল! ইহার কারণ কি? হয় ত' বা সরস্বতীদেবীর চরণেই তাঁহার কোন প্রকার অপরাধ ঘটিয়া থাকিবে—এই ভাবিয়া সরস্বতীমন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—সরস্বতীদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের তত্ত্ব বলিতেছেন,—"নিমাই পণ্ডিত পৃথিবীর পণ্ডিত নহেন, ইনি সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; আমি তাঁহারই স্বরূপশক্তি পরা বিদ্যার ছায়াশক্তি। এতদিনে তোমার মন্ত্রজপের ফল লাভ হইয়াছে, তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথের দর্শন পাইয়াছ, তুমি শীঘ্রই নিমাইর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ কর।"

দিগ্বিজয়ী নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই নিমাইর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। নিমাই দিগ্বিজয়ীকে বেদের কথিত পরা বিদ্যার কথা জানাইলেন,—

ভক্তিই পরা বিদ্যা, ভক্তিলাভই বিদ্যার অবধি। পরা বিদ্যা লাভ করিলে জীব তৃণাদপি সুনীচ হন। পরা-বিদ্যা-বধূর জীবনই হরিনাম। রাজার রাজ্যসুখ, যোগীর যোগসুখ, জ্ঞানীর ব্রহ্মসুখ বা মুক্তিসুখ—সকলই পরা বিদ্যার নিকট অতি তুচ্ছ।

নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ নিমাইকে 'বাদিসিংহ'-পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেশ-বিদেশে নিমাইর কীর্ত্তি বিঘোষিত হইল।

এই দিগ্বিজয়ীকে কেহ কেহ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গুল্য ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট, আবার কেহ বা ইঁহাকে কেশবকাশ্মীরী বলিয়া থাকেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদি সলিমাবাদে ঐ সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—গোপীনাথ ভট্টের শিষ্য কেশব-ভট্ট, কেশব ভট্টের শিষ্য গাঙ্গুল্য ভট্ট ও গাঙ্গুল্য ভট্টের শিষ্য কেশব-কাশ্মীরী। "ভক্তিরত্নাকরে" গাঙ্গুল্য ভট্টের স্থানে গোকুলভট্ট-নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও উহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় 'ক্রমদীপিকা'র লেখক কেশবভট্টের নাম করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে এই কেশবভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,—অনেকে এইরূপ বিচার করেন। পূর্ব্বে ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুরই নিকট উপদেশ ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

আঠার

পূর্ব্ববঙ্গ-বিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান

নিমাই তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলায় জীবজগৎকে আদর্শ গৃহস্থধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ গৃহদেবতা শ্রীবিষ্ণুর বিধিমত পূজানুষ্ঠান

করিবেন। ভগবানের প্রসাদ, বস্ত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব-অতিথি ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণকে বিতরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ অযাচিত প্রতিগ্রহধর্ম্ম স্বীকার করিলেও সমস্ত ভোজ্যসামগ্রী, অর্থ, বস্ত্র মুক্তহস্তে দীন-দুঃখীকে দান করিবেন। অতিথি-সম্মান, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সম্মান গৃহস্থের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ; গৃহস্থ নিজ-পত্নীকে কখনও নিজের ভোগ-সুখে নিযুক্ত না করিয়া ভগবদ্ভক্ত অতিথিগণের ও সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার উপযোগী বিষ্ণুনৈবেদ্য-রন্ধনে ও বিষ্ণুসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। গৃহস্থ যদি একান্ত দরিদ্রও হন, তথাপি তৃণ, জল, আসন অথবা মধুর বাক্যের দ্বারা অতিথি-পূজা করিবেন,—

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে

*   *   *

তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বইসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥

*   *   *

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হৈতে 'অধম' বলি তারে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ অঃ

স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিতেন।

আদর্শ কুলবধূ শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভোর হইবার পূর্ব্বেই বিষ্ণু-গৃহের যাবতীয় কার্য্য, ঠাকুর-পূজার সাজ-সরঞ্জাম-প্রস্তুত ও তুলসীর সেবা করিতেন। তুলসীর সেবা অপেক্ষা শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর সেবায় লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বদাই অধিক মনোযোগ ছিল।

কিছুকাল পরে নিমাই পণ্ডিত অর্থ-সংগ্রহের ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মানদীর তীরে অবস্থান করিলেন। নিমাইর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অসংখ্য ছাত্র নিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশে শুভ-বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও পূর্ব্ববঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তবে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পাষণ্ডি-প্রকৃতির ব্যক্তি উদরভরণের সুবিধার জন্য আপনাদিগকে অবতার প্রচার করিয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-দেব ব্যতীত কলিকালে আর কোন ভগবদবতার নাই। রাঢ়দেশেও কতকগুলি লোক আপনাকে অবতার বলিয়া জাহির করিয়াছে।*

নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীদেবী গৌর-নারায়ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে অন্তর্হিত হন।

নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান-কালে তথায় তপনমিশ্র-নামে এক মহাসৌভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ নানালোকের নিকট নানাপ্রকার উপদেশ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু জীবের

* চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮২-৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কোন্‌টি পরম-মঙ্গলজনক সাধন ও প্রয়োজন, তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন রাত্রিশেষে এক স্বপ্ন দেখেন। তাহাতে তিনি নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। তপনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে নিমাই বলিলেন,— "তুমি অনুক্ষণ,—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'

—এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর। ইহাই সর্ব্ব-দেশ-কাল-পাত্রের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে, ভ্রমণে—সকল সময়ই এই নাম গ্রহণ করিবে। কপটতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একান্ত হইয়া এই নামের ভজন করিবে।"

তপনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে আসিবার অনুমতি চাহিলেন। তাহাতে তিনি মিশ্রকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র কাশী, যাও, কাশীতে তোমার সহিত আমার পুনরায় মিলন হইবে।"

নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও জননীর নিকট সমস্ত অর্থ দিলেন। অনেক পাঠার্থী তাঁহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। গৃহে আসিয়া পণ্ডিত গৃহ-লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের কথা শ্রবণ করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

—"মাতা, দুঃখ ভাব কি কারণে ?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে ?
এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ?
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।

হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায় ?
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ?”

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৮৩-১৮৭

উনিশ

সদাচার-শিক্ষাদান

নিমাই পণ্ডিত যখন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন, তখন কোন ছাত্র ভ্রমক্রমেও কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র * তিলক না দিয়া পড়িতে আসিলে পণ্ডিত তাহাকে এইরূপ লজ্জা দিতেন যে, ঐ ছাত্র দ্বিতীয়বার আর তিলক না দিয়া পড়িতে আসিত না। নিমাই পণ্ডিত বলিতেন, যে ব্রাহ্মণের কপালে তিলক নাই, বেদ সেই কপালকে শ্মশান-তুল্য বলিয়াছেন। এই বলিয়া পণ্ডিত ঐ ছাত্রকে পুনরায় তিলক করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা ত' স্বাদেশিকতার কত বড়াই করি ; কিন্তু এই বঙ্গদেশেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণের যে বেদ-সম্মত সদাচার অবশ্য পালনীয় ছিল, তাহাও এখন আমাদের নিকট লজ্জার বিষয় হইয়াছে। শিখা, তিলক, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ আধুনিক সভ্যসমাজে বোধ হয় অসভ্যতার লক্ষণ ও উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, না হয় উহা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ! আর ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া বেদ-বিরোধী স্বেচ্ছাচারিতা বরণই উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার আদর্শ কি ? অথবা সকলই কালের প্রভাব !

---

* বৈষ্ণবের কপালে ঊর্দ্ধতিলক, অপর নাম—হরিমন্দির।

নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ বাড়ী হইতে পুনরায় তিলক ধারণ করিয়া আসিলে তবে তাঁহার নিকট পুনরায় পড়িবার অধিকার পাইতেন।

নিমাই পণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিতেন,—বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের উচ্চারণ লইয়া বেশ একটুকু রঙ্গরস করিতেন। কেবল পরস্ত্রীর সঙ্গে নিমাই কোন প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেন না, তিনি পরস্ত্রীকে দৃষ্টিকোণেও দেখিতেন না। তিনি যে কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরই পরস্ত্রী-সম্ভাষণে সাবধান ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার গার্হস্থ্যলীলার কালেও তিনি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান ছিলেন। তিনি স্বীয় আচরণের দ্বারা এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-কালে তাঁহাকে নদীয়ার নাগরীগণের নাগর কল্পনা করিতে চাহেন; ইহা কিন্তু মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ। তাই ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

এই মত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা,—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২৮-৩০

বিশ

নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ

নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার কার্য্যে-নিযুক্ত আছেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন, আবার অপরাহ্ণ হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ আলোচনা করিয়া

থাকেন। ছাত্রগণ একবৎসর কাল নিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিয়াই সিদ্ধান্তে পণ্ডিত হন।

এদিকে শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে সনাতনমিশ্র-নামক এক পরম বিষ্ণুভক্ত, পরোপকারী, অতিথিসেবা-পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার অবস্থাও সচ্ছল ছিল, তাঁহার পদবী ছিল— 'রাজপণ্ডিত'। কাশীনাথ পণ্ডিতকে ঘটক করিয়া শচীমাতা সনাতনমিশ্রের পরমা ভক্তিমতী কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে এক ধনাঢ্য সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পণ্ডিতের এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। শুভলগ্নে, শুভদিনে মহাসমারোহের সহিত অধিবাস-উৎসব সম্পন্ন হইল। নিমাই পণ্ডিত সুসজ্জিত একটি দোলায় চড়িয়া গোধূলি-লগ্নে রাজপণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বিবাহের শোভাযাত্রা অতুলনীয় হইয়াছিল। পরম সমারোহের সহিত লক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। একমাত্র বিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়া সনাতনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের হস্তে দুহিতাকে অর্পণ ও জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত পুষ্পবৃষ্টি ও গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির সহিত নিজ-গৃহে শুভবিজয় করিলেন।

একুশ

গয়া-যাত্রা

একদিকে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপকের লীলা করিতেছিলেন, অপর দিকে নবদ্বীপে ভক্তিবিরোধী নানাপ্রকার মতবাদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি

পাইতেছিল। কতকগুলি লোক ভগবানের সেবার কথা দুই কাণে শুনিতে পারিত না। তাহারা অযথা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিতে লাগিল।*

নিমাই পণ্ডিত আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদনের ছলে বহু শিষ্য-সঙ্গে গয়া যাত্রার অভিনয় করিলেন। পণ্ডিতের এই গয়া-যাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল না।

পথে যাইতে যাইতে নিমাই নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর কৌতুক ও স্বচ্ছন্দবিহার দেখিয়া সঙ্গের লোকদিগকে জানাইলেন,—

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্ব্বজন॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্।
যে বুদ্ধি পশুতে, সে মানুষে বিদ্যমান॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাত্রি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ— পশু বলি তারে॥

—চৈঃ মঃ আঃ কৈঃ লীঃ—গয়াযাত্রা ২৫—২৭

নিমাই চলিতে চলিতে চির-নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাহ্নিক করিয়া মন্দার-পর্ব্বতে আসিলেন।

যেমন মথুরায়—কেশব ; নীলাচলে—পুরুষোত্তম; প্রয়াগে—বিন্দুমাধব; কেরলদেশ, দাক্ষিণাত্য ও আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দ্দন ; বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বরদরাজ-বিষ্ণু; মায়াপুরে—(হরিদ্বার ও শ্রীধাম-মায়াপুর-

---

* চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
'ভক্তিযোগ' নাম হইল শুনিতে দুষ্কর॥
নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বুলে—তাহা শুনেন আপনে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫, ৮
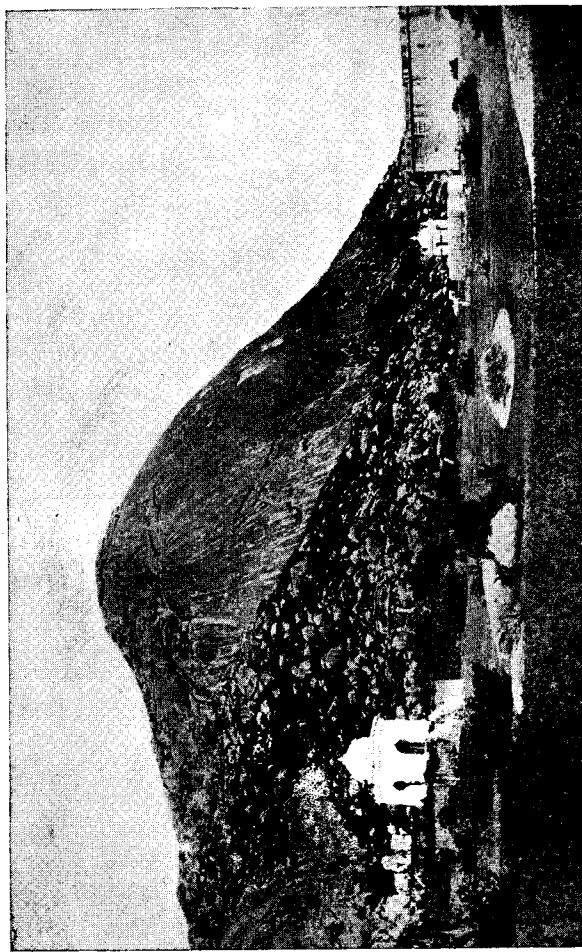
শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কিত মন্দার পর্ব্বত

নবদ্বীপে)—হরি ; তেমনি মন্দারে মধুসূদন। পণ্ডিত নিমাই এই স্থানে ১৪২৭ শকাব্দা বা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আগমন করিয়াছিলেন। তখন পর্ব্বতের নিম্নে মধুসূদন-শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত এই পুণ্যতম স্থানের স্মৃতি-পূজার জন্য তথায় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ইংরাজী ১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক স্থাপন করিয়া ইহার উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

নিমাই পণ্ডিত গয়াভিমুখে আসিবার কালে লোকানুকরণে দেহে জ্বর প্রকাশ করিয়া এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পাদোদক-পানে স্বীয় জ্বর-মুক্তির অভিনয় দেখাইলেন। নিমাইর এই লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ লোক ধরিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের পাদোদকের দ্বারা জীবের ত্রিতাপজ্বালা নষ্ট হয় এবং বৈষ্ণবের পাদোদকের দ্বারা জীবের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়,—এই শিক্ষা প্রদানই ছিল মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ; আবার সাধারণ লোক যাহাতে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে না পারে—ইহাও ছিল তাঁহার অপর এক উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি প্রচ্ছন্ন অবতারী। ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া তৎপ্রসঙ্গে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—

কৃষ্ণ না ভজিলে 'দ্বিজ' নহে কদাচিৎ।
পুরাণ প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥
চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥*

—চৈঃ মঃ আঃ কৈঃ লীঃ গয়াযাত্রা ৫১-৫২

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও মহাপ্রভুর এই বিপ্র-পাদোদক-পানের রহস্য এইরূপ বলিয়াছেন—

---

*বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ-মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ॥

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥
অতএব নাম তা'ন সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।২৫-২৬

নিমাই শিষ্যগণ সহ ক্রমশঃ পুনপুনতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে পুনপুনা নদী প্রবাহিতা। ইহা পাটনার ঠিক পরবর্ত্তী পুনপুন ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত।

পুনপুন তীর্থে আসিয়া নিমাই পিতৃদেব পূজা করিলেন ও তৎপরে গয়ায় আসিলেন। গয়ায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও পিতৃপূজা করিয়া চক্রবেড়-তীর্থে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। এখানে ব্রাহ্মণগণের মুখে গদাধরের শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিমাই প্রেমের সাত্ত্বিকবিকার-সমূহ প্রকাশ করিলেন। এতদিনে মহাপ্রভু জগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। লোকে এতদিন নিমাইকে পণ্ডিতমাত্র বলিয়াই জানিত, তাঁহার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে দূরে পলাইয়া থাকিত। কিন্তু গয়ায় আসিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমভক্তির উৎস উদ্‌ঘাটনের প্রথম সূচনা করিলেন। বেগবতী গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় নিমাইর নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে সেই স্থানে ঈশ্বর-পুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হওয়ায় উভয়ের দর্শনে উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ বহিল। মহাপ্রভু তাঁহার গয়াযাত্রার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কহিলেন,—

প্রভু বলে,—গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন ॥

তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি',—এই চাহি দান॥" —চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭অঃ

নিমাই পণ্ডিত জানাইলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থফল—'সাধুসঙ্গ'। যতক্ষণ মানবের ভাগ্যে সদ্‌গুরুর দর্শন না হয়, যতদিন-না জীব সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের সেবার মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারে, ততদিনই তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান, লৌকিক-পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যানাদিতে অধিকার—ততদিনই ঐ সকল কার্য্যের জন্য রুচি ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে যাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হয়, কেবল তাঁহারই উদ্ধার লাভ হয়; কিন্তু বৈষ্ণব, গুরু ও সাধু-দর্শন-মাত্রই কোটি কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করেন। অতএব বৈষ্ণব ও সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের সহিত তীর্থ সমান নহে। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান করাইতে পারেন।

যে-কাল-পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব জগতে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বকালের কৃত্য হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন নাই, সে-কাল-পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণাদিতে স্নান-দানের প্রয়োজনীয়তার কথাই মানুষে জানিত। যে-কাল-পর্য্যন্ত নিমাই পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরপুরীর ন্যায় কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন না করিয়াছিলেন, সে-কাল-পর্য্যন্তই তিনি গয়াশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লোককে জানাইয়াছিলেন। যাঁহারা সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্ম-

সমর্পণ করেন, তাঁহাদের আর পৃথগ্‌ভাবে গয়া-শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না,—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।

নিমাই পণ্ডিত শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। এমন সময় কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট ঈশ্বর-পুরীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, সমস্তই ঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহা স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার পর শিষ্যের স্বহস্তে গুরুকে নৈবেদ্য নিবেদনের বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শিষ্য সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করিবেন এবং নিজ-ভোগ-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবের সেবা করিবেন,—নিমাই ইহা শিক্ষা দিলেন। *

একদিন একান্তে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর নিকট অত্যন্ত দীনতার সহিত মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করায় ঈশ্বরপুরী সানন্দে নিমাই পণ্ডিতকে দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীকে পরিক্রমা করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বজগতের গুরু লোক-শিক্ষার জন্য আজ গুরু-পদাশ্রয়ের লীলা করিলেন। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া আত্মসমর্পণ না করিলে কেহই কোন দিন পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই সর্ব্বজগদ্‌গুরুর গুরু নবদ্বীপচন্দ্রের গুরু-গ্রহণের অভিনয়।

---

* তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব-অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে ॥—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭ অঃ

নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর সহিত কিছুকাল গয়ায় অবস্থান করিলেন। অবশেষে আত্মপ্রকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনে-দিনে তাঁহার প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিবার কালে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া "কৃষ্ণরে! বাপ্‌রে! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব হরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করিয়া কোথায় লুকাইলে?"—এইরূপে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরম গম্ভীর নিমাই পণ্ডিত আজ পরম বিহ্বল হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন! সঙ্গের ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু—

> প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
> মুই আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
> মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্ব্বথা।
> প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" —চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭ অঃ

ছাত্রগণ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত পণ্ডিতকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহিনী গোপীর ভাবে মগ্ন হইয়া পণ্ডিত কোন কথায়ই সোয়াস্তি পাইলেন না। অবশেষে একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া মথুরার দিকে ধাইয়া চলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণরে! বাপরে মোর! পাইমু কোথায়?"—এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর যাইতেই এক আকাশবাণী হইল,—

* * *

> এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি!
> যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
> নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥
> তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
> অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে॥

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন ॥
চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১২৯—১৩২

আকাশবাণী জানাইয়া দিল—তাঁহার এখনও গৃহত্যাগের কাল উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি কিছুকাল তাঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলেই প্রেমভক্তি বিতরণ আবশ্যক। আকাশবাণী শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত নিবৃত্ত হইলেন এবং বাসায় ফিরিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক ছাত্রগণের সহিত নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাইশ

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে অধ্যাপনা

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই পণ্ডিত সকলের নিকট গয়ার বিবরণ বলিলেন। নির্জ্জনে কএকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট গয়ার বিষ্ণুপাদ-তীর্থের কথা উচ্চারণ করিতেই তাঁহার দেহে অপূর্ব্ব প্রেমের বিকার প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ নিমাইর সেই প্রেম-বিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নিমাইর ইচ্ছানুসারে তৎপর দিবস শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস, শ্রীমান্ গদাধর পণ্ডিত ও সদাশিব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইলেন। নিমাই পণ্ডিত ইঁহাদের নিকট ভগবদ্-বিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! তুমি দেখা দিয়া কোথা' লুকা'লে"—এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তগণও তখন প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পর বিশ্বম্ভর বাহ্যদশা প্রকাশ করিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণরে, প্রভুরে মোর, কোন্‌দিকে গেলা?"

কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, ভক্তগণও তাঁহাকে

বেড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উচ্চকীর্ত্তনরোল ও প্রেমক্রন্দনে শুক্লাম্বরের গৃহ মুখরিত হইল।

শচীমাতা পুত্রের এই ভাব দেখিয়া বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ অন্তরে আশঙ্কিত হইলেন এবং পুত্রের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। সময় সময় শচীমাতা পুত্র-বধূকে আনিয়া পুত্রের নিকট বসাইতেন, কিন্তু কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তপ্রায় নিমাই সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না।* কেবল সর্ব্বক্ষণ 'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ও হুঙ্কার করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভয়ে পলাইয়া যাইতেন, শচীদেবীও ভয় পাইতেন। কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর নিমাইর রাত্রে নিদ্রা ছিল না, কখনও উঠিতেন, কখনও বসিতেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেন। কিন্তু বাহিরের লোক দেখিলে তিনি তাঁহার অন্তরের ভাব গোপন করিতেন।

একদিন প্রাতঃকালে নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বের ছাত্রগণ পড়িবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ছাত্রগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নিমাই পণ্ডিত পড়াইতে বসিলেন, ছাত্রগণ 'হরি' বলিয়া পুঁথি খুলিলেন। ইহাতে পণ্ডিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, হরিনাম শুনিয়াই তাঁহার বাহ্য লোপ পাইল। নিমাই পণ্ডিত আবিষ্ট হইয়া সূত্র, বৃত্তি টীকায় কেবল হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কোথায়ও কিছু নাই—

প্রভু বলে,—"সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন ॥
হর্ত্তা-কর্ত্তা-পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥

---

* লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ —চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৩৭

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥

* * *

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র-বহি' মরে॥
পড়িঞা শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥ —চৈঃ ভাঃ মঃ ১ অঃ

নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ আমি কিরূপ সূত্র ব্যাখ্যা করিলাম?" ছাত্রগণ বলিলেন,—"আপনার ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কেবল প্রত্যেক শব্দকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?" পণ্ডিত বলিলেন,—"আজ পুঁথি বাঁধিয়া রাখ, চল গঙ্গাস্নানে যাই।" গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তুলসীতে জল দিলেন, যথাবিধি গোবিন্দপূজা করিলেন এবং তুলসীমঞ্জরীদ্বারা কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ সেবা করিলেন।

শচীমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই! আজ কি পুঁথি পড়িলে?" নিমাই তদুত্তরে বলিলেন,—

* *,—"আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণের সেবক যে যে জন॥

সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ১অঃ

ভগবদবতার কপিলদেব যেরূপ মাতা দেবহূতিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, নিমাই পণ্ডিতও সেইরূপ স্বীয় জননীকে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা উপদেশ করিলেন, জীবের জন্ম-মরণ-মালা ও গর্ভবাস-দুঃখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর মঙ্গলের উপায় নাই—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী-পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ১অঃ

নিমাই পণ্ডিত আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহর্নিশ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনেন না ও বলেন না। ছাত্রগণ প্রত্যূষে তাঁহার নিকট পড়িবার জন্য আসেন, কিন্তু পড়াইতে বসিয়া পণ্ডিতের মুখে কৃষ্ণ-শব্দ ছাড়া আর কিছু আসে না,—

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ"—বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—"সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥"
শিষ্য বলে,—"বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে।"
শিষ্য বলে,—"পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বলে,—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সোঙর ॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায় ॥" —চৈঃ ভাঃ মঃ ১অঃ

নিমাই পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রগণ হাসিতে লাগিলেন, কেহ বা বলিলেন,—"বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।" একদিন ছাত্রগণ নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া নিমাই পণ্ডিতের ঐরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। উপাধ্যায় গঙ্গাদাস বৈকালে নিমাইকে ছাত্রগণের

দ্বারা ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"নিমাই, তুমি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় পণ্ডিতের দৌহিত্র, মিশ্র পুরন্দরের ন্যায় পিতার পুত্র, তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েই পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিভূষিত। শুনিতেছি,—তুমি আজকাল লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছ, ভালমতে অধ্যাপনা কর না। অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিলেই কি ভক্তি হয়? তোমার বাপ ও মাতামহ কি ভক্ত ন'ন? আমার মাথা খাও, তুমি পাগলামি ছাড়িয়া এখন হইতে ভাল করিয়া শাস্ত্র পড়াও।"

নিমাই গঙ্গাদাসকে বলিলেন,—"আপনার চরণের কৃপায় নবদ্বীপে এমন কেহ নাই—যে আমার সহিত তর্কে জয়ী হইতে পারে। আমি যাহা খণ্ডন করি, দেখি ত' নবদ্বীপে এমন কে আছেন—যিনি তাহা স্থাপন করিতে পারেন? আমি নগরের মধ্যে বসিয়া সকলের সম্মুখে অধ্যাপনা করিব, দেখি, কাহার শক্তি আছে—আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে?"

গঙ্গাতীরে জনৈক পৌরবাসীর গৃহে বসিয়া নিমাই পণ্ডিত এইরূপ নিজের ব্যাখ্যার গৌরব ও আত্মশ্লাঘা করিতেন। একদিন ভাগবত-পাঠক রত্নগর্ভ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণের রূপ দর্শনের শ্লোকটী পড়িতেছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের কর্ণে সেই শ্লোক প্রবিষ্ট হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে বাহ্যদশা লাভ করিয়া পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে গেলেন। পরদিন ভোরে নিমাই পণ্ডিত আবার ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধাতু কাহাকে বলে?" পণ্ডিত বলিলেন,—"কৃষ্ণের শক্তিই ধাতু, দেখি কা'র শক্তি আছে আমার এই ধাতুর খণ্ডন করিতে পারে?" ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। দশদিন ধরিয়া এইরূপে ব্যাকরণের প্রত্যেক

সূত্রকে কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়া শেষে তাহাদিগকে চিরবিদায় দিয়া বলিলেন, —"তোমরা আমার নিকট আর পড়িতে আসিও না, আমার কৃষ্ণছাড়া অন্য কোন বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না; তোমাদের যাঁহার নিকট সুবিধা হয়, তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন কর।" ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পুঁথিতে 'ডোরি' বন্ধন করিলেন এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে শেষ উপদেশ দিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রকে যেরূপ কৃষ্ণ-নামে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, লোকে যাহাতে সেইরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতেও, কৃষ্ণনামের অনুশীলন করিতে পারে, তজ্জন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু **"শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ"** রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্র হরিনামপর করিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

তেইশ

বৈষ্ণবসেবা-শিক্ষাদান

নিমাই পণ্ডিত জড়বিদ্যার অনুশীলন —জড়বিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার লীলা পরিত্যাগ করিয়া পরা বিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের আদর্শ দেখাইলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সেবা ব্যতীত কাহারও ভক্তিবিদ্যা লাভ হয় না, ইহা জানাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তের সেবা করিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে দেখিলে নমস্কার ও তাঁহাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। যখন বৈষ্ণবগণ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন তখন শ্রীগৌরসুন্দর অতি যত্নে কাহারও কাপড়ের জল নিংড়াইয়া দিতেন, কাহারও হাতে ধূতিবস্ত্র তুলিয়া দিতেন, কাহাকেও বা গঙ্গামৃত্তিকা সংগ্রহ

করিয়া দিতেন, আবার কাহারও বা ফুলের সাজি বহন করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেন। *

ভক্তগণ গৌরসুন্দরের এইরূপ বৈষ্ণব-ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট বহুদিনের সঞ্চিত মনের ব্যথা খুলিয়া বলিতেন,—

"এই নবদ্বীপে, বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সব হয় 'বক'! —চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৬৬

কথনও কথনও গৌরসুন্দর অভক্ত-সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া—

"সংহারিমু" সব বলি' করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বারে-বার॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৮৬

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরসুন্দরের এই সকল ভাব দেখিয়া পুত্রের বায়ুব্যাধি হইয়াছে মনে করিতে লাগিলেন। তখন নানা লোকে নানা-প্রকার ঔষধের ব্যবস্থাও দিতে লাগিলেন। পুত্র-বৎসলা সরলা শচীমাতা শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া গৌরসুন্দরকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গৌরসুন্দরের দেহে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশিত। শ্রীবাসের কথায় শচীমাতা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্র পাছে কৃষ্ণভক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করে,—এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

একদিন গৌরসুন্দর গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমায়াপুরে অদ্বৈত-ভবনে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিতে গেলেন; দেখিলেন—অদ্বৈতা-চার্য্য দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার করিয়া গঙ্গাজল তুলসীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রচ্ছন্নাবতারী গৌরসুন্দরকে এবার চিনিতে পারিলেন। আচার্য্য পূজার উপকরণ লইয়া গৌরসুন্দরের চরণ পূজা করিতে করিতে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"—শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪৪-৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

করিতে লাগিলেন। গদাধর অদ্বৈতাচার্য্যকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিহ্বা কামড়াইয়া আচার্য্যকে বালক গৌরসুন্দরের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। আচার্য্য বলিলেন,—"গদাধর, তুমি কএকদিন পরেই এই বালককে জানিতে পারিবে—ইনি কে।" গৌরসুন্দর আত্ম-গোপন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের স্তুতি আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

চব্বিশ

কানাই-নাটশালা

গৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহ ও প্রেমবিকার-সমূহ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন"—কেবল এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতেন। একদিন তিনি ভক্তগণকে বলিলেন,—"গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিবার সময় কানাই-নাটশালা-নামক এক গ্রামে আমি তমালশ্যামল মোহনমুরলীধারী কানাইকে দেখিয়াছিলাম। সে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়াছিল, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কোন্‌দিকে পলাইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না।"

রাজমহল-ষ্টেশন হইতে 'কানাই-নাটশালা'-গ্রাম প্রায় সাত মাইল। এখানে মহাপ্রভুর দুইবার আগমনের কথা পাওয়া যায়; প্রথমবার—১৪২৬ শকাব্দায় গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিবার সময়, দ্বিতীয়বার—১৪৩৬ শকাব্দায় রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাতের পর। মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবনে যাইবেন স্থির হইলে ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ বৃন্দাবনের পথ অত্যন্ত দুর্গম জানিয়া ধ্যানযোগে মহাপ্রভুর জন্য কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত কোমল পুষ্পাস্তরণের পথ রচনা করিতে লাগিলেন।

কানাই-নাটশালা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বাভিমুখে

গঙ্গা প্রবাহিতা। এই স্থানে ইংরেজী ১৯২৯ সালের ১২ই অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্তের একটি পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন।

পঁচিশ

মুরারিগুপ্তের গৃহে

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমেই তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ভগবান্‌কে চরমে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য * শক্তিকে অস্বীকার করেন, গৌরসুন্দর বরাহরূপে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বেদে জড়ীয় আকার নিষেধ করিবার জন্যই পরব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা জড়ীয় আকার ও জড়ীয় বিশেষ ধর্ম্ম নিষেধ করিয়া জড়াতীত নিত্যসচ্চিদানন্দ আকারই স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান্—সর্ব্বশক্তিমান্। আমরা যাহা আমাদের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না, তাহাও ভগবানে সম্ভব। ভগবানের নিত্য আকারও আমাদেরই আকারের ন্যায় অনিত্য আকার হইবে, এরূপ অনুমান করা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করা মাত্র,—ইহা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা।

শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্ন সময়ে মুরারিগুপ্তের গৃহে গমন করিয়া নানা-প্রকার রহস্য ও ক্রোধ-প্রদর্শন-ছলে অনেক প্রকার লোকশিক্ষা দিয়াছেন।

---

* মানবের চিন্তা বা মনীষার অতীত।

ছাব্বিশ

ঠাকুর হরিদাস

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন যশোহর জেলার বুঢ়ন * গ্রামে মুসলমান-কুলে ঠাকুর হরিদাস আবির্ভূত হন। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই হরিনামে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। পিতৃ-মাতৃ-কুলের আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যশোহর জেলার বেণাপোলে নির্জ্জন বনে একটি কুটীর বাঁধিয়া প্রত্যহ রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। হরিদাসের এইরূপ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত লোকই হরিদাসকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কিন্তু সেই গ্রামের তদানীন্তন জমিদার রামচন্দ্র খাঁ যুবক হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করিবার জন্য একটি সুন্দরী বেশ্যাকে হরিদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই কুলটা উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মুহূর্ত্তকালও হরিদাসকে হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন কার্য্য করিতে না দেখিয়া সেই বেশ্যার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বেশ্যা তখন হরিদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহার পাপময় জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হরিনাম আশ্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নামাচার্য্য হরিদাস বেশ্যাকে তাহার সংসারের সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সর্ব্বক্ষণ তুলসীর সেবা ও রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম করিবার উপদেশ দেন এবং স্বয়ং বেনাপোল

---

*চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত, কিন্তু বর্ত্তমান খুলনা জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায়। এই বুঢ়ন পরগণায় ৬৫টী মৌজা আছে, কিন্তু বুঢ়নগ্রামটী কোথায় ছিল, তাহা এখনও ঠিক জানা যাইতেছে না।

পরিত্যাগপূর্ব্বক চাঁদপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। সেখান হইতে আসিয়া হরিদাস ফুলিয়া * ও শান্তিপুর এই উভয় স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

তখন অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। ফুলিয়া ও শান্তিপুরে তখন ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রবল। অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসের নাম-ভজনের জন্য তাঁহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে গোফা (গুহা) প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রত্যহ হরিদাসকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করাইতেন। এই সময় অদ্বৈতাচার্য্যের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, আচার্য্য হরিদাসকে সেই শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করেন,—

তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন ।।—চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০

এই সময় এক রাত্রিতে স্বয়ং মায়াদেবী হরিদাসকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু হরিদাসের কৃপায় মায়াও কৃষ্ণনাম পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। মুসলমানকুলে উদ্ভূত হইয়া হরিদাস হরিনাম করেন, ইহা শুনিতে পাইয়া কাজী নবাবের নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারিগণ হরিদাসকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। হরিদাস কারাগারের মধ্যেও অন্যান্য অপরাধী বন্দিগণকে সদুপদেশ প্রদান করেন। নবাব হরিদাসকে তাঁহার জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

* * *

শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ।।
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে ।।—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬অ ঃ

---

* শান্তিপুরের নিকট একটি গণ্ডগ্রাম।

হরিদাসের এই কথায় কাজী সন্তুষ্ট না হইয়া হরিদাসের দণ্ডবিধান করিতে নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাবের নানাপ্রকার ভয়প্রদর্শন সত্ত্বেও হরিদাস বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪

কাজীর আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ হরিদাসকে বাইশ বাজারে অতি নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করিলেও হরিদাসের অঙ্গে কোন প্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত কিংবা প্রাণবিয়োগ না হওয়ায় উহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পাছে প্রহারকারিগণের কোন প্রকার অমঙ্গল হয়, এই ভাবিয়া হরিদাস কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন,—

এ সব জীবেরে কৃষ্ণ, করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩

হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কাজীর কর্ম্মচারিগণ কাজীর নিকট কঠোর শাস্তি পাইবে শুনিয়া হরিদাস কৃষ্ণধ্যান-সমাধি-দ্বারা নিজকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। হরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া হরিদাসের অসদ্গতির জন্য কাজী হরিদাসকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে তীরের নিকট আসিলেন এবং বাহ্যদশা লাভ করিয়া পুনরায় ফুলিয়া-গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও তথায় পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকিলেন।

ফুলিয়ায় যে গুহার মধ্যে হরিদাস ভজন করিতেন, তথায় একটি ভীষণ বিষধর সর্প বাস করিত। ওঝাগণের অনুরোধে হরিদাস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে ঐ সর্পটীই আপনা হইতে গুহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কতিপয় ব্যক্তি নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের উচ্চ সংকীর্ত্তন অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, মনে মনে নাম জপ করিলে কেবল নিজের উপকার হয়, কিন্তু উচ্চকীর্ত্তনের দ্বারা নিজের ও পরের উপকার হইয়া থাকে,—এমন কি, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতারও তাহাতে সুকৃতি সঞ্চিত হয়।

জগতের এইরূপ বহির্ম্মুখ অবস্থা দেখিয়া হরিদাস বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবার জন্য কিছুকাল পরে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তখন নবদ্বীপ-মায়াপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের টোল ও বৈষ্ণব-সভা ছিল। নবদ্বীপে হরিদাসকে পাইয়া অদ্বৈত-প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

গয়া হইতে ফিরিবার পর ক্রমে ক্রমে গৌরসুন্দর হরিসংকীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে শ্রীবাসের গৃহে যে নিত্য সংকীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান সহায় হইলেন—ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীবাস।

সাতাশ

নিত্যানন্দের সহিত মিলন ও ব্যাসপূজা

শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার বার বৎসর বয়সে জন্মস্থান একচক্রা-নগর হইতে এক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সহিত ভারতের সমস্ত তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান ঘুরিয়া অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। সেই সময় গৌরসুন্দর নবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-প্রভু যেন গৌরসুন্দরের মহা-প্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। নবদ্বীপে গৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে

অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে আসিয়া তথায় নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিলেন। নন্দনাচার্য্য নবদ্বীপবাসী জনৈক বৈষ্ণব ছিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের আগমনের পূর্ব্বেই বৈষ্ণবগণের নিকট বলিতেছিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই কোন এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিবেন। তখন বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর কথার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। যে-দিন নিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেইদিন মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবের নিকট বলিলেন যে, তিনি গতরাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন তালধ্বজরথে চড়িয়া নীলবস্ত্র-পরিহিত এক মহাপুরুষ তাঁহার গৃহ-দ্বারে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে নবদ্বীপে ঐ মহাপুরুষের সন্ধান করিতে বলিলেন। পণ্ডিত ও হরিদাস সমস্ত নবদ্বীপে ও তাহার পারিপার্শ্বিক গ্রাম-সমূহের প্রতি ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও কোন মহাপুরুষকে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহারা এই কথা জানাইলে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইয়া বরাবর নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিলেন। ইনিই সেই পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ।

মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নিত্যানন্দের মহিমা প্রকাশ করিলেন। এক পূর্ণিমা-রাত্রিতে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় নিত্যান্দ-প্রভু ব্যাসপূজা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সর্ব্বশাস্ত্রকর্ত্তা শ্রীব্যাসের কৃপায়ই আমরা ভগবানের সকল কথা জানিতে পারি, এজন্য সাধুগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পূজাও—'ব্যাসপূজা'। শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই ব্যাসপূজার আয়োজন হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য হইলেন। পূর্ব্বদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণের সহিত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। তৎপর দিন

প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর গলায় ব্যাসের মালা পরাইয়া দিলেন।

ব্যাসপূজার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের ছোট ভাই রামাইকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন এবং আচার্য্যকে বলিবার জন্য বলিয়া দিলেন—যাঁহার জন্য আচার্য্য এত আরাধনা করিয়াছেন, তিনি এখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া তথায় ভক্তি বিতরণ করিতেছেন এবং তাঁহারই অভিন্নাত্মা নিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

আচার্য্য নবদ্বীপে আসিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য পথে রামাইকে বলিয়া দিলেন—তিনি যেন মহাপ্রভুর নিকট গিয়া বলেন যে, অদ্বৈত মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিতে চাহিলেন না। শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্যের বাড়ীতে গোপনে অবস্থান করিলেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু অদ্বৈত কোথায় আছেন, ধরিয়া ফেলিলেন। তখন সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈত নিমাইর নিকট আসিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বন্দনা করিলেন ও নিমাইর স্বরূপ সকলকে জানাইয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে নিজের পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যরসে সেবা করিতে থাকিলেন।

আটাশ

জগাই-মাধাইর উদ্ধার

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপের নগরে-নগরে, ঘরে-ঘরে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচারের জন্য ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দ-প্রভুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন নিত্যানন্দ-প্রভু গৃহে-গৃহে নাম প্রচার করিয়া নিশাকালে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় 'জগাই' 'মাধাই'

নামে দুইজন মাতাল ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইল। ইহারা না করিয়াছে, জগতে এমন কোন পাপ সৃষ্ট হয় নাই। সকল সময়েই মাতালগণের সহিত অবস্থান করায় তাহারা কেবলমাত্র 'বৈষ্ণব-নিন্দা' করিবার সুযোগ পায় নাই। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস জগাই-মাধাইকে কৃপা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিত্যানন্দ-প্রভু যেন তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলেই সেই নিশা নবদ্বীপে বেড়াইতেছিলেন। জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুকে দেখিতে পাইল। মাধাই 'অবধূত' নাম শুনিয়াই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ-প্রভুর শিরে 'মুটকী' * নিক্ষেপ করিল। জগাই ইহা দেখিয়া মাধাইকে বাধা দিল। এমন সময় মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলেন। নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে,তাহাকে ক্ষমা করা আবশ্যক।" মহাপ্রভু জগাইর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইহাতে মাধাইর চিত্তেরও পরিবর্ত্তন হইল। নিত্যানন্দ-প্রভু মাধাইকে ক্ষমা করিলে তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়ায় এবং **জীবনে আর কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিবে না**, কেবলমাত্র **নিষ্কপট হরিসেবাতেই জীবন যাপন** করিবে,—এই **প্রতিজ্ঞা** করায় তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভু এবং ভক্তগণেরও কৃপা হইল। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় দুইজন দস্যুও তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়া 'মহাভাগবত' হইলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব চরিত্র স্মরণ করিয়া কেহ যেন ইঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অনাদর না করেন, মহাপ্রভু ভক্তগণকে এইরূপ আদেশ দিলেন।

ব্রাহ্মণ-কুলীন-প্রধান নদীয়া-নগরে মুসলমানকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা নাম-প্রচারের আদর্শ এবং নিত্যানন্দের দ্বারা জগাই-

* ভাঙ্গা হাড়ী

মাধাইর উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু জানাইলেন,—বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাকৃত জাতি-কুলের অন্তর্গত নহেন, তিনি অতিমর্ত্ত্য বস্তু—জগদ্‌গুরু। তিনি আরও জানাইলেন,—যাঁহারা হরিনাম প্রচার করিবেন, হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা হরিকথা ও হরিনাম-বিতরণের বিনিময়ে কোন প্রকার অর্থ, দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন না। হরিকথা ও হরিনাম—সাক্ষাৎ হরি। হরিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টার ন্যায় অপরাধ আর নাই। এই লীলায় মহাপ্রভুর আরও একটি শিক্ষা— সর্ব্ব-প্রকার অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার সামর্থ্য স্বয়ং ভগবানেরও নাই। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার নিকট অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ-নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিকেই শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করেন।

মহাপ্রভু যে ক্রোধ-ভরে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারও রহস্য আছে। ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রদর্শনই ক্রোধ-বৃত্তির সদ্‌ব্যবহার। যেমন, হনূমান রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন। ঐরূপ ক্রোধ প্রদর্শন না করা ভগবান্‌ ও ভক্ত-প্রীতির অভাব সূচনা করে।

জগাই-মাধাই গৌর-নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া পূর্ব্বের নানা-প্রকার দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন এবং সাধুসঙ্গে তীব্রভাবে হরিভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের সঙ্গ ও স্মৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন এবং পূর্ব্বের দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া গৌরনাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন। মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। নিত্যানন্দের আদেশে মাধাই প্রতিদিন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গার ঘাটের সেবা, ঘাটে

সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা-প্রভাবে মাধাইর "ব্রহ্মচারী" খ্যাতি হইল। মাধাই স্বহস্তে কোদালী লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট "মাধাইর ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ হইল। গৌড়ীয়মঠের নবদ্বীপ পরিক্রমার পথে শ্রীমায়াপুরে এই "মাধাইর ঘাট" এখনও দেখা যায়।

ঊনত্রিশ

"সাতপ্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ"

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণুবিগ্রহের খাটের উপর বসিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন—বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ মহাপ্রভু একে একে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ভাব সপ্ত-প্রহর পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকায় ভক্তগণ ইহাকে 'সাতপ্রহরিয়া ভাব' বা 'মহাপ্রকাশ' বলেন। ভক্তগণ 'পুরুষসূক্তে'র* মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে মহাপ্রভুর অভিষেক ও বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ভোগ দিলেন। এই অভিষেক 'রাজরাজেশ্বর অভিষেক' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে এক দাসী ছিল। সকলে তাহাকে 'দুখী' বলিয়া ডাকিত। মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাবের সময় প্রভুর অভিষেকের জন্য কলসী ভরিয়া গঙ্গাজল আনিবার জন্য ঐ দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। 'দুখী'র আন্তরিক সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং উপযাচক হইয়া দুখীর আনিত জল স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার 'দুখী' নাম বদলাইয়া 'সুখী' নাম রাখিলেন।

---

* পুরুষসূক্ত—ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র।

এই লীলা-দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন, জাগতিক দৃষ্টিতে অতি সামান্য দুঃখী স্ত্রীলোকও হরি-সেবাবৃত্তি-ফলে জগতের তথাকথিত সুখিগণের দুষ্প্রাপ্য পরম ধন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে। জাগতিক দৃষ্টিতে অভাবক্লিষ্ট থাকিয়াও নিত্যপরমার্থ-রাজ্যে তিনি পরম সুখী ও পরম ধনবান্ হইতে পারেন। সেবাই—সুখ, অভক্তিই—দুঃখ ও দারিদ্র্য।

মহাপ্রভু শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের নিকট শ্রীধরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে শ্রীধরকে থোড়-মোচা-বিক্রেতা দরিদ্র-ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া তাঁহার মহিমা জানে না। পক্ষান্তরে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ শ্রীধরকে কত কিছু বলিয়া থাকে,—

"মহা চাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে॥" —চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।১৪৮

শ্রীধর উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু শ্রীধরের হরিসেবার কথা সকলকে জানাইলেন, শ্রীধরও মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—"তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি বর দিতেছি।" শ্রীধর বলিলেন, "প্রভো, আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন কেন? সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির নিকট কি কেহ ধূলিমুষ্টি প্রার্থনা করে? আমি এসব কিছুই চাহি না, অষ্টসিদ্ধি ত' ছার, জ্ঞানি-যোগি-ঋষিগণ যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাও ভগবানের সেবার নিকট অতি তুচ্ছ! যে ব্রাহ্মণ আমার থোড়-কলা-মোচা কাড়িয়া খান, সেই ব্রাহ্মণ জন্মে জন্মে আমার প্রভু হউন—ইহাই আমার প্রার্থনা, আমি আর কিছুই চাইনা।"

মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে কৃপা করিলেন এবং সকলের নিকট মুরারির মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, একবারও যে ব্যক্তি মুরারির নিন্দা করিবে, কোটি গঙ্গাস্নানেও তাহার নিস্তার হইবে না, গঙ্গা-হরিনামই তাহাকে সংহার করিবে।*

---

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ঠাকুর হরিদাসকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

> "এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়।
> তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩৬

পাপিষ্ঠ বিধর্ম্মিগণ তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহা আমার নিজের শরীরে গ্রহণ করিয়াছি ; এই দেখ, আমার শরীরে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। মহাপ্রভু তখন হরিদাসকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কখনও কোন অপরাধ হইবে না, তিনি ভক্তির স্বাভাবিক অধিকারী। ঠাকুর হরিদাসের চরিত্র-দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

> জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
> প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে ॥
> যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
> তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥ —চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ অঃ

ত্রিশ

"খড়যাঠিয়া বেটা"

মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিন সকল ভক্তই তাঁহার নিকট আসিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুও একে একে সমবেত ভক্তগণকে কৃপা করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ তখন পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মুকুন্দ মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া থাকেন, আজ সেই মুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এইরূপ অসন্তোষ কেন, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীবাস মুকুন্দকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,— "আমি উহাকে কৃপা করিতে পারি না, মুকুন্দ সমন্বয়বাদী—"খড়যাঠিয়া

বেটা"।* সমন্বয়বাদী অর্থাৎ যাহারা সকলের ধর্ম্মকথাতেই "হাঁ জী, হাঁ জী" করিয়া সকল দলে মিশে, আত্মার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যে অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি, তাহাকেও অন্যান্য মতের ন্যায়ই একটি মতবিশেষ মনে করে, যখন যে সভায় যায়, তাহাদেরই অনুরূপ কথা বলে, সেইরূপ ব্যক্তি আমার পায়ে এক হাত ও গলায় আর এক হাত দিয়া থাকে। কোন সময়ে তাহারা লোক-দেখান দৈন্য করিয়া দন্তে তৃণ ধারণ করে, আবার কোন সময় লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসে। যথেচ্ছাচারিতা উদারতা নহে। ভক্তি ও অভক্তি, মুড়ি ও মিছরিকে একাকার করিলে কেহ কখনও ভগবানের কৃপা পায় না। যাহারা ভক্তির সহিত অপর সাধনকেও সমান জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারা আমার গায়ে লাঠি মারে।† তাহারা যদিও সময় সময় ভক্তির ভাণ দেখাইয়া পূজা, কীর্ত্তন পাঠ, প্রভৃতি করিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের ঐরূপ কপটতায় আমি সন্তুষ্ট হই না। তাহাদের ঐ সকল স্তব-স্তুতি আমার অঙ্গে বজ্রাঘাততুল্য বোধ হয়। মুকুন্দ ভক্ত-সমাজে হরিকীর্ত্তন করে, ভক্তির কথা বলে, আবার মায়াবাদীর নিকট যোগবাশিষ্ঠের মায়াবাদ স্বীকার করিয়া থাকে।

মহাপ্রভুর মুখে এই সকল কথা শ্রবণের পর মুকুন্দের মায়াবাদি-সঙ্গ পবিত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু মুকুন্দকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন।

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু একটি মহাশিক্ষা দিয়াছেন। অনেক সময় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া লোকপ্রীতি অর্জ্জনের জন্য সকল দলের সকল কথায় 'হাঁ, হাঁ' বলিবার যে প্রবৃত্তি লোক-সমাজে দেখা যায়, তাহা উদারতা নহে—উহা কপটতা ও

---

* খড়—তৃণ, যাঠি—যষ্টি বা লাঠি।

† চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৩-১৮৫, ১৮৮—১৯২

পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী প্রীতির অভাব-মাত্র। ভগবানে অনুরাগি-জনের চরিত্রে ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহার তৃপ্তি-বিধানের প্রতিই একান্ত নিষ্ঠা থাকিবে,—তাহা কল্পিত নিষ্ঠা নহে—গোঁড়ামি নহে। গোঁড়ামিতে তত্ত্বান্ধতা আছে ও শ্রীহরির প্রতি প্রীতি নাই। আর অব্যভিচারিণী ভক্তিতে, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা এবং যাহাতে যাহাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তৎসমস্ত ব্যতীত অন্যবিষয়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে তীব্র নিরপেক্ষতা আছে। লোক-প্রীতির যূপকাষ্ঠে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতিকে বলি দেওয়া কখনও উদারতা নহে,—উহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা মাত্র।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরু-ভ্রাতা ছিলেন। সেজন্য মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর এইরূপ গৌরব প্রদর্শনে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ড-প্রসাদ পাইবার জন্য শান্তিপুরে যাইয়া শুষ্কজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর অন্তরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুকে শুষ্কজ্ঞানী * বিচার করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুর শুষ্ক-জ্ঞান ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া অদ্বৈতপ্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। এই প্রহার-প্রসাদ লাভ করিয়া অদ্বৈতপ্রভু আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিলেন,—"আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।"

---

* শুষ্কজ্ঞানী—যাঁহারা ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বীকার করেন না এবং তাঁহার সেবাকে অনিত্য জড় ব্যাপার মনে করেন।

একত্রিশ

শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তন

শ্রীবাস-ভবন গৌর-নিত্যানন্দের নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইল। এই শ্রীবাস-ভবন মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী। শ্রীবাস-গৃহে এক বৎসর ব্যাপিয়া এই সঙ্কীর্ত্তন-রাস হইয়াছিল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের নিত্যানন্দের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি আমার একান্ত গুপ্ত সম্পত্তি নিত্যানন্দকে যখন বিশেষভাবে চিনিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকে আমি একটি বর দিতেছি,—

> বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
> সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২১

যাঁহারা ভগবানের সেবায় অকপট অনুরাগী, এইরূপ সম-চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া মহাপ্রভু প্রতি রাত্রে শ্রীবাস-অঙ্গনে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কোন কোন দিন চন্দ্রশেখরের বাড়ীতেও এইরূপ কীর্ত্তন হইত। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, মুরারি, ঠাকুর হরিদাস, গঙ্গাদাস, হিরণ্য, বনমালী, বিজয়, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, গোপীনাথ, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় প্রভৃতি সমচিত্ত-বৃত্তি-বিশিষ্ট ভক্তগণ ছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের নিত্য সঙ্গী।

শ্রীবাসের অঙ্গনে একাদশী-দিন প্রত্যূষ হইতে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-নৃত্য আরম্ভ হইত এবং অহোরাত্র ব্যাপিয়া চলিত। মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাড়ীর

দ্বার বন্ধ করিয়া কেবল ভক্তগণেরই সহিত কীর্ত্তন করিতেন। যাহাদের ভগবানের প্রতি ভক্তি নাই, কেবল রঙ্গ-তামাসা দেখিবার জন্য বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবার জন্যই সঙ্কীর্ত্তন শুনিবার ও দেখিবার কৌতূহল ছিল, তাহাদিগকে মহাপ্রভু প্রবেশ করিতে দিতেন না; বহু লোক শ্রীবাসের গৃহের দ্বারে আসিয়া কবাট খুলিবার জন্য বাড়ীর দ্বারে করাঘাত করিত। কিন্তু প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না বলিয়া মহাপ্রভু ও ভক্তগণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিত। কেহ বলিত, "এগুলি সকলে পেট-ভিখারী, লোক দেখিলে লজ্জা পাইবে, এই জন্য দ্বার বন্ধ করিয়া থাকে।" তাহা শুনিয়া আবার কেহ বলিত,—"হাঁ ভাই! ঠিক বলিয়াছ, নতুবা অষ্টপ্রহর এইরূপ চীৎকার করে কেন?" আবার কেহ বলিয়া উঠিত,—"আরে ভাই! তুই আসল কথা জানিস্ না, ইহারা কপাট বন্ধ করিয়া মদ খায় ও মাতলামী করে।" আবার কেহ কেহ বলিত,—"পূর্ব্বে ত' নিমাই পণ্ডিত ভাল ছিল, এখন এইরূপ হইল কেন?" তাহার উত্তরে কেহ বলিত,—"আরে সঙ্গদোষে কি না হয়! কেহ ত' আর ইহার অভিভাবক নাই, বাপ নাই, বড় ভাই নাই, তাতে আবার বায়ুরোগী, খারাপ লোকের সঙ্গে মিশিয়া এইরূপ হইয়াছে! লেখাপড়া ছাড়িয়া মাতলামী করিয়া বেড়াইতেছে!" কেহ বা বলিয়া উঠিল,—"আরে ভাই! আমি আসল কথা জানিতে পারিয়াছি, ইহারা রাত্রে স্ত্রীলোক লইয়া ব্যভিচার করে। আমরা দেখিলে পাছে ভাল লোকের কাছে বলিয়া দিই, এজন্যই কবাট দিয়া নানাপ্রকার চীৎকার করিতে থাকে।"

কেহ কেহ বলিত,—"আজকার রাত্রি কোন রকমে কাটুক, কালই সকালে ইহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপরদ্দ করাইব। রাজার লোক ইহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। যাহা রাজ্যশুদ্ধ ছিল না, এরূপ এক সঙ্কীর্ত্তন সৃষ্টি করিয়া নিমাই দেশে দুর্ভিক্ষ আনিল,

দেবতা বিরূপ হইল, দেশে অনাবৃষ্টি, ব্যবসার সুবিধা নাই! কিছু অপেক্ষা কর. দেখা যাইবে শ্রীবাসিয়া, অদ্বৈতাচার্য্য কি করিতে পারে? কোথা হইতে এক বেটা অবধূত 'নিত্যানন্দ' নাম ধরিয়া আসিয়া জুটিয়াছে,— শ্রীবাসিয়ার ঘরে থাকিয়া কত রঙ্গ, ঢঙ্গ দেখাইতেছে। সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হওয়া কখনও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়, লেখাপড়া শিখিয়াও কি লোক এইরূপ ছোট কাজ করে! এইগুলির মুখ দেখিতে নাই! এইগুলির সঙ্গে কথা বলিলে বিদ্যাবুদ্ধি সব নষ্ট হইয়া যায়! দেখ না, নিমাই পণ্ডিত কিরূপ বুদ্ধিমান্ ছিল, কিন্তু এখন এইগুলির সঙ্গে কি হইয়াছে! কেবল চীৎকার করিলেই কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায়? ভগবান্ পাইতে হইলে নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণা চাই। দেহের মধ্যেই সব আছে। এগুলি ভিতর ছাড়িয়া কেবল বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছে! সকলে একত্র ভোজন করিয়া লোকের জাতি নষ্ট করিতেছে! শ্রীবাসিয়ার ঘর ভাঙ্গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিব। এই বাম্‌নাকে গ্রামের বাহির করিতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই!"*

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ এই সকল বহির্ম্মুখের কথায় কাণ না দিয়া অহর্নিশ হরিকীর্ত্তন করিতেন।

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে অপমান করিবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিত। একদিন 'গোপাল চাপাল' নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান দেবীপূজার উপহার সহ মদ্যভাণ্ড রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। সেই বৈষ্ণবাপরাধে কিছু দিনের মধ্যেই তাহার গলৎকুষ্ঠ রোগ হইল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিলেও তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া মহাপ্রভু তৎকালে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার

* চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২৩৪—২৭৪

পর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন কুলিয়ায় অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন গোপাল চাপাল মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীবাসের কৃপায় গোপালের অপরাধ ভঞ্জন হইল। *

আর এক রাত্রিতে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী শ্রীবাসের বাড়ীর যে গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই গৃহের এক কোণে লুকাইয়া-ছিলেন। অন্তর্য্যামী গৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন,—"কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোথায়ও লুকাইয়া রহিয়াছে, নতুবা আজ কীর্ত্তনে আমার আনন্দ হইতেছে না কেন?" শ্রীবাস বহু অনুসন্ধানের পর গৃহের কোণে লুক্কায়িত নিজ-শ্বাশুড়ীকে চুলে ধরিয়া বাহির করিবার আদেশ দিলেন। ইহা দ্বারা পণ্ডিতবর ভক্তরাজ শ্রীবাস জানাইলেন যে, ভগবানের সেবাই সকল মর্য্যাদার শিরোমণি। তবে সামাজিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করা সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

এক রাত্রিতে মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের একটি পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। মহাপ্রভুর সেবার অর্থাৎ কীর্ত্তনের রসভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস গৃহের পরিবারবর্গকে শোক করিতে সম্পূর্ণ নিষেধ করিলেন। অধিক রাত্র পর্য্যন্ত শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন-ভঙ্গের পরে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, তথায় নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে। এইরূপ বিপদের সংবাদ তাঁহাকে এতক্ষণ না দেওয়ায় মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মৃত শিশুকে সম্মুখে আনিয়া তাঁহার মুখ হইতেই শ্রীবাস-গৃহের পরিবারবর্গকে তত্ত্বো-পদেশ শ্রবণ করাইলেন। মৃত শিশুর মুখে তত্ত্বোপদেশপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পরিবারবর্গের আর কোন শোক রহিল না। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে

---

* চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৩৭—৪৫

বলিলেন,—"তোমার যে পুত্র ছিল, সে তোমাকে ছাড়িয়া গেল ; আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না।"

বত্রিশ

দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে প্রতি নিশায় সংকীর্ত্তন করেন শুনিয়া একজন ব্রহ্মচারীর সেই সংকীর্ত্তন-নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। ব্রহ্মচারী আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কেবল দুগ্ধ ও ফল খাইয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁহার জীবনে কোন পাপ-স্পর্শ হয় নাই। তিনি দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবাস পণ্ডিতকে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্য দর্শনের জন্য একদিন রাত্রিতে শ্রীবাসের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুরোধে এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, তপস্যা ও নিষ্পাপ-জীবন স্মরণ করিয়া উক্ত ব্রহ্মচারীকে গৃহে প্রবেশের অধিকার দিলেন ও গুপ্তভাবে অবস্থান করিবার কথা বলিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বলিলেন,—"আজ যেন আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইতেছে না; মনে হয়, এখানে কোন বহিরঙ্গ লোক প্রবেশ করিয়াছে।" শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"এখানে কোন খারাপ লোক প্রবেশ করে নাই, একজন নিষ্পাপ-জীবন আকুমার ব্রহ্মচারী, দুগ্ধপায়ী, তপস্বী ব্রাহ্মণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আপনার সংকীর্ত্তন-নৃত্য শ্রবণ ও দর্শন করিতে আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন,—

দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥

*　　　*　　　*

অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার ?
বিনা মোরে শরণ লইলে নাহি পার॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩ অঃ

ভয়ে ও লজ্জায় ব্রহ্মচারী শ্রীবাসের গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর উপর ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে মনে মনে ভাবিলেন, —"আমার আজ পরম সৌভাগ্য! আমি যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহারই দণ্ড পাইলাম; কিন্তু আমি আজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলাম।" অন্যান্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় ব্রহ্মচারীর মহাপ্রভু বা তাঁহার ভক্তগণকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি না হওয়ায় তিনি মহাপ্রভুর কৃপা পাইলেন। পরে মহাপ্রভু ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন এবং উপদেশ দিলেন,—

প্রভু বলে,—"তপঃ করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥"—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪

অনেকে নিজের ব্রহ্মচর্য্য, আভিজাত্য, তপস্যার অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া মনে করেন, ভগবদ্ভক্তগণ কেনই বা তাঁহাদিগকে হরিসংকীর্ত্তন প্রভৃতিতে অধিকার বা ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিবেন না। কিন্তু লোক-শিক্ষক মহাপ্রভু ঐ লীলাদ্বারা এইরূপ বিচারের অসারতা শিক্ষা দিলেন।

তেত্রিশ

শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা

নবদ্বীপে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভিখারী বলিয়াই মনে করিত ; কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবতা

বুঝিতে পারিত না। মহাপ্রভু তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে ক্ষুদ-কণা-সংযুক্ত চাউল কাড়িয়া খাইতেন। ভগবান্ অর্থের বশ নহেন,—সেবার বশ। দাম্ভিক ধনবানের কোন নৈবেদ্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না; কিন্তু অকিঞ্চনের অতি সামান্য বস্তুও নিজে যাচিয়া গ্রহণ করেন।

একদা নিশাকালে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-নৃত্য সমাপ্ত করিয়াছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ হইতে পুনঃ পুনঃ ধূলি লইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে সবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। নিত্যানন্দ, হরিদাস মহাপ্রভুকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে উঠাইলেন। সেই রাত্রিতে মহাপ্রভু বিজয়-আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলাকালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা গৃহী বা সন্ন্যাসী গুরু-গোস্বামীর বেশে স্ত্রীলোকের দ্বারা পদসেবা, পদস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ ব্যক্তিও চরণ-ধূলি-দান প্রভৃতির ছলে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবেন না। ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলা-দ্বারা মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণের আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন মুসলমান দর্জ্জি শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিতেন। দর্জ্জি শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে মহাপ্রভু সেই ভাগ্যবান্ দর্জ্জিকে নিজ-স্বরূপ দর্শন করাইলেন। সেই দর্জ্জি তখন হইতে "আমি কি দেখিনু! আমি কি দেখিনু!!"—বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে-

ছিলেন। তাহা শুনিয়া কোন ছাত্র বলিয়া উঠিল,—"নামের আবার এত মহিমা কি? ইহা কেবল নামকে বড় করিবার জন্য অতিস্তুতি মাত্র। এক নামেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, আর কিছুতেই হইবে না—এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি পণ্ডিত-সমাজে চলিবে না।" নামের অতুলনীয় মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা—'নামাপরাধ'। ইহাই সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই শাস্ত্রের সম্মান রক্ষাকারী মহাপ্রভু নামাপরাধী ছাত্রের মুখ দর্শন করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া ভক্তগণের সহিত তৎক্ষণাৎ সচেল * গঙ্গাস্নান করিলেন।

এক দিবস মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত নগর-সংকীর্ত্তনে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সেই বীজ হইতে বৃক্ষ হইল ও সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষে ফল ধরিল। সেই আম্রদ্বারা আম্রোৎসব হইল। এ স্থানটি সম্প্রতি আম্রহট্ট † ('আমঘাটা') বলিয়া প্রসিদ্ধ।

একদিন মহাপ্রভু বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল, প্রভু মেঘকে দূর হইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। মেঘ তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। এইজন্য ঐ গঙ্গাচর-ভূমিকে লোকে 'মেঘের চর' বলিত। একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলদেবের আবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা প্রকাশ করিয়া 'মধু আন', 'মধু আন' বলিতে লাগিলেন। সেই সময় চন্দ্রশেখর আচার্য্য, বনমালী আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর হস্তে স্বর্ণ-মূষল দর্শন করিয়াছিলেন।

* চেল—বস্ত্র, সচেল অর্থে—পরিহিত বস্ত্রের সহিত।

† নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে 'আমঘাটা' রেল-ষ্টেশন।

চৌত্রিশ

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন "পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিলেন,—কৃষ্ণের একনাম 'পুণ্ডরীক', বোধ হয়, মহাপ্রভু কৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকলের নিকট বলিলেন,—"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামক এক অদ্ভুত চরিত্র ভক্ত শীঘ্রই শ্রীমায়াপুরে আসিবেন।" সত্য সত্যই অবিলম্বে পুণ্ডরীক নবদ্বীপে আসিলেন। পুণ্ডরীক বাহিরে দেখিতে সাধারণ বিষয়ী ও ভোগীর ন্যায় ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে আবির্ভূত ভক্ত মুকুন্দ এই বিদ্যানিধির মহিমা জানিতেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতকে পুণ্ডরীকের মহিমা জানাইয়া সেই অদ্ভুত বৈষ্ণবকে দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গদাধর পণ্ডিত আকুমার ব্রহ্মচারী,—বিষয়ে বিরক্ত। পুণ্ডরীককে দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক, অশ্রদ্ধারই উদয় হইল। রাজপুত্রের ন্যায় পুণ্ডরীক চন্দ্রাতপের তলে, বহুমূল্য-সিংহাসনে উচ্চ গদীর উপরে বসিয়া রহিয়াছেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়াছেন, তাঁহার কত প্রকার বিলাসের দ্রব্য! দুইজন লোক সর্ব্বদা ময়ূরের পাখাদ্বারা বাতাস করিতেছেন। গদাধর মনে করিলেন,—এইরূপ লোক কি আবার ভক্ত হইতে পারেন? মুকুন্দ গদাধরের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক একটি শ্লোক পাঠ করিলেন, অমনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অদ্ভুত প্রেমের আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক-বিকার-সকল প্রকাশিত হইল। গদাধর বিদ্যানিধির অদ্ভুত চরিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি

যে এই মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু অবিলম্বে বিদ্যানিধির চরণাশ্রয় করিবার জন্য গদাধরকে আদেশ করিলেন।

বাহিরের চেহারা ও ক্রিয়া-মুদ্রা দেখিয়া সকল সময় মহাভাগবত মহাপুরুষের চরিত্র বুঝা যায় না।

এক রাত্রিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের গৃহে মহাপ্রভু স্বয়ং রুক্মিণীর বেষ ধারণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও শ্রীহরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে বিভিন্ন ভাব ও বেষ গ্রহণ করাইয়া একটি অপূর্ব্ব লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই শ্রীগৌরসুন্দর **বঙ্গীয় অভিনয়ের সর্ব্বপ্রথম অবতারণা** করেন। বর্ত্তমান যুগে বিশ্বের সর্ব্বত্র যে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচারিত হইতেছে, সেই প্রচারের মূল-কেন্দ্র "শ্রীচৈতন্যমঠ" এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পঁয়ত্রিশ

চাঁদকাজী

মহাপ্রভু হরিনাম-প্রচারের প্রারম্ভে শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত 'হরিনাম' করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে-দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি-বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পর হইতে নবদ্বীপের ফৌজদার চাঁদকাজীর সময় পর্য্যন্ত 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইত না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের

আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতে থাকিল, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী জনৈক কীর্ত্তন-কারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহার জাতিভ্রষ্ট করা হইবে,—এইরূপ ভয়ও দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়া-ছিলেন, সেই স্থান তখন হইতে 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নগরবাসী ক্ষুব্ধ সজ্জনগণ এই সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে নিত্যানন্দ-প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং সমস্ত নগরবাসীকে একত্রিত করিয়া তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিরাট্ কীর্ত্তনমণ্ডলী গঠন করিলেন; পরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে তাঁহার গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু কাজীকে বাহিরে ডাকাইয়া আনাইয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী মহাপ্রভুর মুখে ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর হইলেন। কাজী বলিলেন,—"যে-দিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই মানুষের মত শরীর ও সিংহের মত মস্তকবিশিষ্ট এক

মহাভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি তাঁহার বুকের উপরে লাফ্ দিয়া চড়িয়া দাঁত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন,—'তুমি কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বুক ফাড়িয়া দিব—তোমাকে সবংশে বধ করিব'।" কাজী ইহা বলিয়া মহাপ্রভুকে নিজের বুকে নখের আঁচড় দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন,—সেই দিন তাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্ত্তনে বাধা দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, কোথা হইতে হঠাৎ অগ্নি-উল্কা আসিয়া তাহার মুখে লাগিয়া তাহার সমস্ত দাড়ি পুড়িয়া মুখ ক্ষত করিয়া দিয়াছে। সেই পেয়াদা তাঁহাকে আরও জানাইয়াছে,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস,—এইরূপ নাম-পরিচয়ে 'হরি হরি' বলিয়া থাক ; 'হরি হরি' শব্দে 'চুরি করি, চুরি করি',—এই অর্থ হয় ; তাহাতে বোধ হয় অপরের গৃহের ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি হরি' উচ্চারণ কর। যে-দিন আমি তাঁহাদের সহিত এরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হরি হরি' বলিতেছে।" কাজী আরও জানাইলেন,—ইহার পর একদিন কতকগুলি ('পাষণ্ডী') হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিয়াছে,—"নিমাই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে ; পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি-পূজায় রাত্রি জাগরণ করা একটা ধর্ম্মের কাজ ছিল, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম-মত প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সময়ে বে-সময়ে উচ্চ-কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ও নগরে শান্তিভঙ্গ হইতেছে। নিমাই নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন আবার সর্ব্বত্র আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছে।

ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল, নবদ্বীপ উচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবারই ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করিতেছে! অতএব আপনি যখন আমাদের গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার একটা ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া অবিলম্বে তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিন।"

মহাপ্রভু কাজীর মুখে হরিনাম-উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপে আর সঙ্কীর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—"আমার বংশের কেহই কোনদিন কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না। আমি আমার বংশে এই 'তালাক'* দিয়া যাইব।" অদ্যাপি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে কাজীর বংশধরগণ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিলে এই চাঁদকাজীর প্রাচীন সমাধি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এই চাঁদকাজীর পাট রক্ষা করিতেছেন।

* দিব্য বা শপথ

নবদ্বীপের ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা
মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত চাঁদকাজীর সমাধি

ছয়ত্রিশ

ললিতপুর—দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে ও শান্তিপুর—অদ্বৈত-গৃহে

একদিন গৌর ও নিত্যানন্দ শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের স্থানে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে ললিতপুর-নামে এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারে হাটডাঙ্গার পরে এই গ্রাম অবস্থিত। ললিতপুরে এক গৃহি-বাউল বা দারি-সন্নাসী * বাস করিত। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ ঐ সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী "ধন, বংশবৃদ্ধি ও উত্তম বিবাহ হউক্"—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"সন্ন্যাসিবর! ইহা ত' আশীর্ব্বাদ নহে। 'কৃষ্ণের কৃপা হউক্'—ইহারই নাম আশীর্ব্বাদ। 'বিষ্ণুভক্তি লাভ হউক'—এই আশীর্ব্বাদই অক্ষয় ও অব্যয়। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করা আপনার উচিত নহে।" ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল,—"পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম মাত্র, আজ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইলাম। আজকাল লোককে ভাল বলিলে লোকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসে! কোথায় আমি ছেলেটিকে মনের সন্তোষে উত্তম আশীর্ব্বাদ করিলাম, আর সে তাহাতে দোষ ধরিল! পৃথিবীতে জন্মিয়া যাহার সুন্দরী কামিনী-সম্ভোগ ও ধন-দৌলত হইল না, তাহার জীবনই বৃথা। তোমার শরীরে যদি 'বিষ্ণুভক্তি' হয়, আর তোমার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে?"

---

* যে-সকল তামসিক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী (?) সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়াও গৃহস্থের ন্যায় পরস্ত্রী লইয়া বাস করে।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"লোক নিজ-নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। ধন-জনের জন্য কামনা করিয়াও ত' লোকে তাহা পায় না। শরীরকে ভাল করিবার বহু চেষ্টা করিলেও শরীরে অলক্ষিত-ভাবে রোগ প্রবেশ করে। এ সকল কথা সকলে বুঝে না। বিষয়-সুখে লোকের রুচি দেখিয়া বেদ নানাপ্রকার কাম্যকর্ম্মের প্ররোচনা দিয়া থাকেন। গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিলে ধন-পুত্র পাওয়া যাইবে, এই লোভেও যদি বিষয়ী লোক গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিতে উদ্যত হইয়া সাধুসঙ্গে গঙ্গা ও হরিনামের প্রকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে—এই উদ্দেশ্যেই বেদে কর্ম্মের নানা ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কোন উৎকৃষ্ট বর নাই।*

মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া দারি-সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বালক এবং নিজকে বহুতীর্থ-পর্য্যটক পরম জ্ঞানী বিচার করিল!

অনধিকারী ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর ঐ সকল কথার আদর হইবে না বুঝিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু দারি-সন্ন্যাসীকে মৌখিক সম্মান দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং সন্ন্যাসীর গৃহে কিছু দুগ্ধ-ফলাদি ভোজন করিলেন। দারি-সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ-প্রভুকে ইঙ্গিতে কিছু মদ্যপানের জন্য অনুরোধ করিল। মহাপ্রভু ইহা শুনিবামাত্র 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করিয়া আচমন করিলেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দের সহিত ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন ও গঙ্গা সন্তরণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক-বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে।।—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৯৫

---

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৬০—৬৯

"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর এই কথা মহাপ্রভুর চরিত্রে সর্ব্বদাই দেখা যায়। দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে আসিয়া গৌর-নিত্যানন্দ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ কি, তাহা জানাইলেন ; আরও জানাইলেন,—ভগবান্ কখনও কখনও স্ত্রৈণ, মদ্যপায়ী প্রভৃতি পাপী ব্যক্তিগণকেও স্বেচ্ছায় কৃপা করিতে পারেন,—যদি তাহারা ঐ সকল পাপ চিরতরে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলাকে স্বীকার করেন না, সেই সকল নিন্দক, জ্ঞানী যতই ত্যাগী ও পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না। এই স্থলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আর একটি শিক্ষা এই যে, যাহারা মদ্যপান ও পরস্ত্রী-সঙ্গ প্রভৃতি পাপ-কার্য্য করে, তাহাদের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। মদ্যপানের নাম-মাত্র শুনিয়া মহাপ্রভু বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তের চরিত্র কখনও পাপযুক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য বা নেশার বশীভূত নহেন।

গৌর-নিত্যানন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু—ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা অদ্বৈত-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদ লাভের জন্য জ্ঞানকে বড় বলিলেন। মহাপ্রভু আচার্য্যের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তখন অদ্বৈত-প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি আমাকে পূর্ব্বে সম্মান দিতে বলিয়া তোমার দণ্ড লাভের জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, আমি জন্মে-জন্মে যেন তোমার দাস থাকিতে পারি।"

সাঁইত্রিশ

দেবানন্দ পণ্ডিত

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে মোক্ষকামী এক পরম সুশান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবানন্দ আজন্ম সংসারে বিরক্ত, তপস্বী ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভাগবতের মহা অধ্যাপক বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। ভাগবত পাঠ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না—তাঁহার হৃদয়ে মুক্তির বাসনা প্রবল ছিল। দৈবাৎ একদিন মহাপ্রভু সেই পথে গমন-কালে দেবানন্দের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

* *,—"বেটা কি অর্থ বাখানে' !
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥

* * *

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায় ॥

* * *

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥"—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১ অঃ

মহাপ্রভুর এই লীলাতে ভাগবত-পাঠের অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। জাগতিক পাণ্ডিত্য বা উচ্চবংশে জন্ম, কিংবা জাগতিক পুণ্য-পবিত্রতা থাকিলেই ভাগবত বুঝা যায় না। ভগবানে একান্ত সেবা-বৃত্তি-দ্বারাই ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি হয়।

বৈষ্ণবরাজ শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ হইয়াছিল। একদিন ভাগবত-পাঠকালে দেবানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীবাসের অসম্মান করেন। তিনি গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের ঠাঁই যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেমবাধ ॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৮

আটত্রিশ

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সূচনা

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিজের ঘরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে "গোপী, গোপী" নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, একজন পাষণ্ড-প্রকৃতির ছাত্র সেই সময় মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি কৃষ্ণনাম না করিয়া 'গোপী গোপী' এই স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতেছেন কেন? গোপী নাম করিলে কি পুণ্য হইবে?" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগা ছাত্র তাহা বুঝিতে পারিল না। গোপীভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতী এক ব্যক্তিজ্ঞানে ঠেঙ্গা লইয়া মারিবার জন্য ক্রোধভরে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ছাত্রটী পলায়ন করিল। ইহা শুনিয়া নবদ্বীপের যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও ছাত্র-সমাজ ক্ষেপিয়া গিয়া গৌরসুন্দরকে প্রহার করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

মহাপ্রভু ইহা জানিতে পারিয়া হেঁয়ালীচ্ছলে বলিলেন,—

"করিল পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে॥"—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১২৯

কোথায় নদীয়াবাসীর নিত্যমঙ্গলের জন্য হরিনাম প্রচার করিলাম, আজ কি না তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থিত ঔষধই তাহাদের অপরাধ-বৃদ্ধির কারণ হইল!

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন নিত্যানন্দকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ও তাহার কারণ বলিলেন,—তিনি জগতের উদ্ধারের জন্য জগতে আসিয়াছেন, কিন্তু নবদ্বীপবাসী তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া ফেলিতেছে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহাদের দুয়ারে ভিখারী হইলে নবদ্বীপবাসী সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতেও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলে ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে।

মহাপ্রভু মুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণমঙ্গল গান করিতে বলিলেন এবং পরে তাঁহার নিকটও নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি গদাধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার নিকটও নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। গদাধর নানাভাবে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"নিমাই! সন্ন্যাসী হইলেই কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়? গৃহস্থ ব্যক্তি কি বৈষ্ণব হইতে পারেন না? তুমি অনাথিনী মাতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে? প্রথমেই ত' তোমার জননী-বধের ভাগী হইতে হইবে।"*

এইরূপে মহাপ্রভুর আরও কএকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের কথা ব্যক্ত করিলেন। সকলেরই মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইবেন শুনিয়া ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় শচী-মাতার কাণেও এই দারুণ সংবাদ পৌঁছিল; শচীমাতা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইকে কত বুঝাইলেন,—

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১৭২ – ১৭৪

"না যাইহ, না যাইহ বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥"—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।২২

শচীমাতার বিলাপ শুনিয়া পাষাণও দ্রবীভূত হইল; কিন্তু বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল যাঁহার হৃদয়, সেই লোকশিক্ষক মহাপ্রভুকে তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে কেহই বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি মাতাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

আনের (১) তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম্ম (২) ॥

* * *

আমি আনি' দিব কৃষ্ণ-প্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ ॥—চৈঃ মঃ মঃ ১৪৮ পৃঃ গৌঃ সং

কলিকালে কৃষ্ণ শ্রীনামরূপে ও শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হন। গৌরসুন্দর শচীমাতাকে বলিলেন,—"শীঘ্রই আমার এই দুইটি অবতার হইবে অর্থাৎ আমার নাম ও শ্রীমূর্ত্তি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবে।" *

মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী অবিলম্বেই সফল হইয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাসের পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরহ-ব্যথিতা হইয়া হৃদয় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলে গৌর-নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মাতা, পিতা ও ভার্য্যার সেবা ছাড়িয়া ভগবানের সেবা বা ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে অন্যায় মনে করেন; বস্তুতঃ যাঁহারা হরিসেবার মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারাই ইহা বলিয়া থাকেন। হরিসেবা-দ্বারাই মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেশ, সমাজ ও বিশ্বের যথার্থ

(১)আনের—অপরের, (২) পরধর্ম্ম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভগবৎসেবাধর্ম্ম।

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭-৪৯

সেবা হয়। গাছের মূলে জল দিলেই শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল—সকলেই সঞ্জীবিত ও সংবৰ্দ্ধিত হয়। এইরূপ সন্ন্যাসের উজ্জ্বল আদর্শ ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব ও মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীশুকদেবে দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলদেব স্বামীহীনা জননী দেবহূতিকে, শুকদেব স্বীয় পিতা ব্যাসদেবকে উপেক্ষা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ শ্রীনিমাইও—

শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি ॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০৩-১০৪

এক সময়ে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বার-রুদ্ধ-গৃহে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন ও নৃত্যে যোগদান করিতে না পারিয়া অন্যদিন মহাপ্রভুকে গঙ্গার ঘাটে পাইয়া মনের দুঃখে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক্।" মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণের এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়াছিলেন।* শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছিলেন, জগতের লোকের অভিশাপও কৃষ্ণ-সেবায় লাগিলে তদ্দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। বস্তুতঃ ভগবান্ গৌরসুন্দর কোন অভিশাপের আসামী হইতে পারেন না। তাঁহার ঐ লীলা জীব শিক্ষার জন্য।

---

* চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৩২—৬৩

উনচল্লিশ

নিমাইর সন্ন্যাস

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দর নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও কাটোয়া-গ্রামে * শ্রীকেশবভারতী নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং শচীমাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দ—মাত্র এই পাঁচজনের নিকট ইহা প্রকাশ করিতেও বলিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বদিন মহাপ্রভু সকল ভক্তকে লইয়া সারাদিন সংকীর্ত্তন করিলেন, সন্ধ্যায় গঙ্গা-দর্শন ও নমস্কার করিতে গেলেন, গৃহে ফিরিয়া ভক্তগণ-বেষ্টিত হইয়া বসিলেন। তারপর তিনি সকলকে নিজের গলার প্রসাদী মালা প্রদান করিয়া বলিলেন,—

যদি আমা-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭-২৮

সন্ন্যাসের দিন সন্ধ্যার পর শ্রীধর একটি লাউ হাতে করিয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন এবং আর একজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কিছু পরেই দুগ্ধ ভেট দিলেন। মহাপ্রভু শচীমাতাকে দিয়া দুগ্ধ-লাউ পাক করাইলেন এবং তাহা ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। গদাধর ও হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করিয়া থাকিলেন। শচীমাতা জানিতেন—আজ নিমাই গৃহত্যাগ করিবে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই,—

---

* বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। "ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া" লাইনে কাটোয়া নামক একটি রেলষ্টেশন আছে।

সর্ব্বক্ষণ কেবল অশ্রু—রাত্রি প্রভাত হইতে আর চা'র দণ্ড বাকী আছে জানিয়া মহাপ্রভু গৃহত্যাগের উদ্‌যোগ করিলেন এবং গদাধর মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে চাহিলেন, তিনি একাকী গমনের ইচ্ছা জানাইলেন। শচীদেবী নিমাইর গমনের উদ্‌যোগ বুঝিতে পারিয়া দ্বারে বসিয়া রহিলেন ; নিমাই জননীকে তখন অনেক প্রবোধ দান করিয়া ও তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিলেন। শচীমাতা শোকের আধিক্যে জড়প্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন যে, শচীমাতা বহির্দ্বারে বসিয়া আছেন। শ্রীবাস কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ; পরে অতি কষ্টে কোন প্রকারে বলিলেন,—"ভগবানের বস্তুর অধিকারী ভক্তগণ, সুতরাং নিমাইর যে-কিছু জিনিষ আছে, তাহা ভক্তগণ লইয়া যাইতে পারেন। আমি যথা ইচ্ছা, তথা চলিয়া যাইব।" ভক্তগণ মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ বুঝিতে পারিয়া অচেতনপ্রায় হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া সকলেই শচীমাতাকে বেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদীয়ায় মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের বার্ত্তা প্রচারিত হইল ; তাহা শুনিয়া পূর্ব্বের নিন্দক পাষণ্ডিগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নিমাইকে পূর্ব্বে চিনিতে না পারায় বিশেষ পরিতাপ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার চব্বিশ বৎসরের শেষে মাঘী শুক্লপক্ষে উত্তরায়ন-সময়ে সংক্রমণ-দিনে রাত্রিশেষে নবদ্বীপ হইতে নিদয়ার ঘাটে আসিলেন। শুনা যায়,—নিঠুর নিমাইর সন্ন্যাস-লীলার স্মৃতিতে এই ঘাটের নাম 'নিদয়ার ঘাট' হইয়াছে। এই ঘাট যেন নির্দ্দয় বা নিদয় হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প মহাপ্রভুকে কাটোয়ায়

যাইবার পথ দিয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা সন্তরণ-পূর্ব্বক কাটোয়া-গ্রামে কেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। মুকুন্দাদি ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন, মহাপ্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, চন্দ্রশেখর সন্ন্যাস-বিধির অনুষ্ঠান-সমূহ করিতে লাগিলেন। নাপিত নিমাইর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ অনর্গল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে দিবা প্রায় অবসান হইল। কোনপ্রকারে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইলে লোকশিক্ষাগুরু মহাপ্রভু ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটি বলিয়া ইহাই তাহার সন্ন্যাস-মন্ত্র কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে কেশবভারতী সেই মন্ত্র মহাপ্রভুর কর্ণে দিলেন। সর্ব্বগুরু মহাপ্রভু বস্তুতঃ কেশবভারতীকেই মন্ত্র দিয়াছিলেন, অথচ গুরুগ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা জানাইবার জন্য কেশবভারতীর নিকট হইতে কর্ণে মন্ত্র শুনিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রচার করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া ভগবদিচ্ছায় কেশবভারতী নিমাইর সন্ন্যাস-নাম রাখিলেন—**'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'**। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' ধ্বনি উঠিল।

চল্লিশ

পরিব্রাজকবেষী গৌরহরি

শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু কাটোয়ায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নবদ্বীপে

পাঠাইয়া দিয়া তিনি ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখী চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অগ্রে কেশবভারতী, পশ্চাতে গোবিন্দ এবং সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর ও মুকুন্দ। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু অবন্তীদেশের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন এবং তিনদিন ধরিয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের চাতুরীতে মহাপ্রভু শান্তিপুরের নিকট—পশ্চিম পারে আসিয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ-প্রভু স্থানীয় গোপবালকগণকে গোপনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি মহাপ্রভু তাহাদের নিকট বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তবে যেন তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দেয়। নিত্যানন্দের কথামত তাহারা তাহাই করিল। মহাপ্রভুও গঙ্গাকে যমুনা মনে করিয়া স্তব করিলেন। মহাপ্রভু কেবল কৌপীন-মাত্র সম্বল করিয়া চলিয়াছিলেন, আর দ্বিতীয় কোন বস্ত্র ছিল না। এমন সময় অদ্বৈতা-চার্য্য নৌকায় চড়িয়া নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস লইয়া অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে সেই কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন।

অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা-ঠাকুরাণী বহুবিধ ভোজ্যসামগ্রী রন্ধন করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তাহা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে ভোগ দিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও মুসলমানকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে আপনার সহিত একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ সেবা করিবার জন্য ডাকিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করিবেন—এই ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভুর ভোজনের পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিবার জন্য চেষ্টা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"বহু ত' নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥—চৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৬

তখন মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈতাচার্য্য মুকুন্দ ও হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ সম্মান করিলেন।

মহাপ্রভুর এই লীলায় দুইটি শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ,—তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা নিত্যকাল তাঁহার পাদসেবা করিলেও তিনি লোক-শিক্ষার্থ অদ্বৈত-প্রভুর পাদসেবা স্বীকার করিলেন না। সাধক-সন্ন্যাসী বা সাধক-জীবের পাদসম্বাহনাদি সেবা-গ্রহণ অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মর্য্যাদা-সংরক্ষণ আচার্য্যের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই—ভগবানের ভক্তে জাতিবুদ্ধি ও ভগবানের প্রসাদে স্থান-কাল-পাত্র-সম্পর্কে স্পর্শদোষ বিচার করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে পতন হয়। মুকুন্দ দত্ত লৌকিক ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত নহেন, আর ঠাকুর হরিদাস ত' বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত মুসলমানকুলেই আবির্ভূত; কিন্তু শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ-গৃহে যথেচ্ছভাবে মহাপ্রসাদ সেবা করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুরও সাক্ষাৎ আদেশ ছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, একমাত্র শ্রীক্ষেত্রেই প্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করিতে হয় না; কিন্তু শান্তিপুরে গৃহস্থ-লীলার অভিনয়কারী অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আচরণ ঐরূপ উক্তির অসারতা প্রমাণ করিল। ইহার অনেক পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রও প্রদান করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আধুনিক যুগে যে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্রভুই তাহার প্রবর্ত্তক,—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রত্যেক ঘটনা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যাঁহারা প্রকৃত পরমার্থ আশ্রয় করিয়াছেন, মহাপ্রভু একমাত্র তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই জাতিবুদ্ধি ও কেবলমাত্র মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে স্পর্শ-দোষের জাগতিক বিচার

নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ আশ্রয় করেন নাই বা যেখানে ভোগবুদ্ধিতে নানাপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করা হয়, সেই সকল পার্থিব মনুষ্য বা ভোগ্যখাদ্যদ্রব্যে জাতিবিচার বা স্পর্শদোষাদির বিচার না থাকিলে সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। নানাপ্রকার জাগতিক অভিলাষ, ভোগ বা সুবিধাবাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্রভু সেই সকলের প্রবর্ত্তক নহেন। তিনি পরমার্থ-সমাজেরই শিক্ষক—পারমার্থিক শিক্ষকগণেরই নিয়ামক।

নবীন সন্ন্যাসী গৌরহরির অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান-কালে শান্তিপুরের সমস্ত লোক তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ হইল। মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে মহাপ্রভুর সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ যুগপৎ প্রকাশ হইতে থাকিল। পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপের বহুভক্তের সহিত শচীমাতা দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন—সন্ন্যাসী পুত্রের সহিত শচীমাতার সাক্ষাৎকার হইল। মহাপ্রভু অদ্বৈত-গৃহে দশ দিবস অবস্থান করিয়া শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান, নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত হরিকীর্ত্তন এবং শচীমাতার হস্তপাচিত দ্রব্য ভিক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসিগণের আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নবদ্বীপবাসিগণকে বলিলেন,—"সন্ন্যাস করিয়া কাহারও আত্মীয়-স্বজনের সহিত নিজ-জন্ম-স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।

শচীমাতাও পুত্রের এই কথা শুনিয়া 'নিমাইর যাহাতে সুখ, তাহাই হউক্', বিচার করিয়া তাঁহাকে নীলাচলে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী সকলকে নিরন্তর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার সহিত জীবন যাপনের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শান্তিপুরের ভক্তগণ ও শচীমাতাকে বিদায় দিলেন এবং নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত ছত্রভোগের পথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

একচল্লিশ

পুরীর পথে

মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর হইয়া উৎকল-রাজ্যের এক সীমায় উপনীত হইলেন ; পথে নানাপ্রকার আনন্দকীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে 'ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ' দর্শন এবং তথায় ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরীর কথিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও গোপীনাথের প্রসঙ্গ বর্ণন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী-কৃত "অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ!" শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তথায় সেই রাত্র যাপন করিয়া পরদিন পুরীর অভিমুখে পুনঃ যাত্রা করিয়া যাজপুর হইয়া কটকে পৌঁছিলেন। তথায় "সাক্ষিগোপাল" * শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মুখে গোপালের ইতিহাস শ্রবণ করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বর আসিয়া ক্ষেত্রপাল শিব দর্শন করিলেন। কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে কপোতেশ্বর-শিব দর্শনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের নিকট নিজের দণ্ডটি রাখিয়া গেলেন। ভগবানের পক্ষে সাধক জীবের উপযোগী দণ্ডাদি ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই,—ইহা জানাইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। আঠারনালার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার দণ্ড না পাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। মহাপ্রভুর এইরূপ

---

*তখন কটকে 'সাক্ষিগোপাল' শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। পরে পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে "সত্যবাদী" গ্রামে অবস্থিত হন।

বাহ্যে ক্রোধ প্রদর্শনের গূঢ় শিক্ষা এই যে, ভগবান্ বা পরমহংস বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মদণ্ড বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে, কিন্তু অনর্থযুক্ত (১) সাধকের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত করা (২) অবশ্য প্রয়োজন; নতুবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগৌরহরি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। পড়িছা * ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে মারিতে গেল। পুরীর রাজপণ্ডিত বাসুদেব ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম তখন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন; তিনি দৈবাৎ মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহাকে পড়িছার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। সার্ব্বভৌম যুবক সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত মুকুন্দকে দেখিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও পুরী আগমনের যাবতীয় কথা শুনিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। এদিকে সার্ব্বভৌমের গৃহে তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের

(১) যাহাদের জগতের বস্তুতে আসক্তি আছে, ভগবানে সর্ব্বক্ষণের জন্য স্বাভাবিকী প্রীতি উদিত হয় নাই।

(২) দেহ, মন ও বাক্য—এই তিনটিকে দণ্ডিত অর্থাৎ শাসিত করিয়া হরিভজন করিবার জন্যই দণ্ডগ্রহণ।

* শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারি-বিশেষ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার, পুরী

পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে স্বীয় মাতৃষ্বসা-গৃহে বাসাঘর স্থির করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌমের সহিত গোপীনাথের মহাপ্রভু-সম্বন্ধে আলাপ হইলে গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভুকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া জানাইলেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার ছাত্রগণের সহিত গোপীনাথের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরের তত্ত্ব কখনই জানা যায় না এবং জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-দ্বারা ঈশ্বরের ভক্তি-জ্ঞান হয় না—গোপীনাথ এই সকল কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এক প্রকার নিরস্ত করিলেন।

বিয়াল্লিশ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাধারণ সন্ন্যাসি-মাত্র বিচার ও তাঁহার যৌবন-বয়স দর্শন করিয়া তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে উপদেশ করিলেন। মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত হইয়া সার্ব্বভৌমের নিকট সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনী দেখিয়া অষ্টম দিনে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—তিনি ব্যাসকৃত সূত্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার অর্থ অতীব পরিষ্কার ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের রচিত ভাষ্য সেই সকল সূত্রের সহজ-নির্ম্মল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শঙ্করভাষ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্ত-বিরুদ্ধ ; অসুর-গণের মোহনের জন্য ভগবানের আদেশে শিবের অবতার আচার্য্য শঙ্কর ঐরূপ ভাষ্য কল্পনা করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদান্তের প্রকৃত মত। মায়াবাদিগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। শ্রীমন্ মহাপ্রভু

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বহু প্রমাণ-বিচার-দ্বারা এই সকল বিষয় প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার-তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন।

ইহার পর ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামশ্চ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকেই প্রথমে ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বলে উক্ত শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন; মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের উক্ত ব্যাখ্যার কোনটীই স্পর্শ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য্য ইহাতে চমৎকৃত হইলেন। তখন তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগতি যাচ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও তখন সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সার্ব্বভৌমকে প্রথম চতুর্ভুজ এবং পরে দ্বিভুজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের চিত্তে তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি হইল; তিনি তখনই—

বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৪, ২৫৫

এই দুইটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং একশত শ্লোক রচনা করিয়া স্তব করিলেন।

সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর এইরূপ আলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই আনন্দিত হইলেন। ইহার পর একদিন মহাপ্রভু খুব ভোরে শ্রীজগন্নাথদেবের পাকাল প্রসাদ* লইয়া ভট্টাচার্য্যকে

* পান্তা প্রসাদকে পুরীতে পাকাল প্রসাদ বলা হয়।

দিতে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া মাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় লৌকিক স্মার্ত্তগণের জাগতিক বিচার হইতে মুক্ত হওয়ায় সেইক্ষণেই—প্রাতঃকৃত্যাদি করিবার পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর প্রদত্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

সার্ব্বভৌম একদিন মহাপ্রভুর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি,—এই পরিপ্রশ্ন করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

আর এক দিবস সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্ভাগবতের তত্তেঽনুকম্পাং (ভাঃ ১০।১৪।৮) শ্লোকের শেষাংশে "মুক্তিপদে" পাঠের পরিবর্ত্তে "ভক্তিপদে" পাঠ করিয়া প্রভুকে শুনাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই, 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচলবাসিগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং কাশীমিশ্র প্রভৃতি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন।

তেতাল্লিশ

দাক্ষিণাত্যাভিমুখে

শ্রীগৌরসুন্দর মাঘমাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে বাস করিলেন। তিনি ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার এবং বৈশাখ মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। একাকীই দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইবেন,—মহাপ্রভু এইরূপ প্রস্তাব করায় নিত্যানন্দ-প্রভু বিশেষ অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণদাস নামক একজন সরল ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। সার্ব্বভৌম চারিখানি কৌপীন-বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন এবং গোদাবরী নদীর তীরে রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন

নিত্যানন্দ-প্রভু প্রভৃতি কএকজন ভক্ত আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ভাবাবেশে চলিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর মুখে কেবল এই ধ্বনি—

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ হে !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে !!
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্ ॥
রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! পাহি মাম্ ॥

শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই 'হরিনাম' উচ্চারণ করিতে লাগিল। মহাপ্রভু শরণাগত ব্যক্তিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া দক্ষিণাত্য-বাসীকে বৈষ্ণব করিলেন—শ্রীচৈতন্যের কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর ভাবে প্রকাশিত হইল। এইরূপে মহাপ্রভু কূর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কূর্ম্ম-নামক এক ব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন এবং স্বয়ং আচার্য্য হইয়া অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। 'বাসুদেব' নামক একজন গলিত কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত বিপ্রকে কূর্ম্ম-গৃহে কৃপা করিয়া তাঁহাকেও দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত করিয়া আচার্য্য করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভুর 'বাসুদেবামৃতপদ' নাম হইল।

মহাপ্রভু ক্রমে জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্র সিংহাচলে গমন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও বন্দনা করিলেন। * তথায় রাত্রিবাস করিয়া

* বি, এন্, আর, লাইনের শেষ ষ্টেশন ওয়ালটেয়ারের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন সিংহাচল। ষ্টেশন হইতে কএক মাইল দূরে সিংহাচল-পর্ব্বতের উপর শ্রীনৃসিংহ-দেব বিরাজমান।

পরদিন প্রাতে পুনরায় প্রেমাবেশে চলিতে চলিতে গোদাবরী-তীরে আগমন করিলেন।

চুয়াল্লিশ

রায় রামানন্দ-মিলন

প্রায় ১৫০২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সম্রাট্ গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা **(Governor)** রায় রামানন্দ গোদাবরীর তীরে গোষ্পদতীর্থের ঘাটে শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিতে আসিতেছিলেন। রাজমহেন্দ্রী নগরে 'কোটিলিঙ্গম্' তীর্থের অপর পারে এই গোষ্পদ বা 'পুষ্করম্' তীর্থ অবস্থিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রী হইতে গোষ্পদ-তীর্থে আগমন করিলেন। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত দোলায় চড়িয়া একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকেই রামানন্দ রায় বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রামানন্দও এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। মহাপ্রভু রামরায়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন, উভয়ের দর্শন-স্পর্শনে উভয়ের প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল। রামানন্দ মহাপ্রভুকে তথায় পাঁচ সাতদিন কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু সেই গ্রামে কোন এক বৈদিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ও ভিক্ষা করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ রায় অত্যন্ত দীনবেশে আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তখন রামরায়কে বলিলেন,—"জীবের সাধন ও সাধ্য-বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ বল।" রামানন্দ উত্তর করিলেন,—"বিষ্ণুভক্তিই জীবের প্রয়োজন, ভগবানের সেবার মূল উদ্দেশ্যে **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম** পালন করিলেই বিষ্ণু প্রীত হন।"

মহাপ্রভু কহিলেন,—“ইহা অত্যন্ত বাহিরের কথা, আরও আগের কথা বল।” রায় বলিলেন,—“কৃষ্ণে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ অর্থাৎ **কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান** করিতে করিতেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়।” মহাপ্রভু বলিলেন,—“**এহো বাহ্য,** আগে কহ আর।” তখন রামানন্দ রায় কহিলেন,—“বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া **ভগবানে শরণাগতি,** যাহা গীতার চরমোপদেশ—তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।” মহাপ্রভু বলিলেন,— “এহো বাহ্য, আগে কহ আর।” তদুত্তরে রামরায় বলিলেন,— “**জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি** আরও শ্রেষ্ঠ।” মহাপ্রভু বলিলেন,—“এহো বাহ্য, আগে কহ আর।” এবার রামরায় বলিলেন,—“**জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণগ্রহণ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—এই সকলের মধ্যে ন্যূনাধিক মিশ্রভাব আছে, কিন্তু জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তিতে কোন প্রকার মিশ্রভাব নাই।” এজন্য জ্ঞানশূন্য-ভক্তির কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—“এহো হয়, আগে কহ আর,— হাঁ, কেবলা ভক্তি বাহিরের জিনিষ নয়, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও আগের কথা বল।” তখন রামরায় বলিলেন,—“কেবলা ভক্তি হইতেও **প্রেমভক্তি** শ্রেষ্ঠ।” মহাপ্রভু তখনও বলিলেন,—“**এহো হয়,** আগে কহ আর।” ইহার উত্তরে রামরায় ক্রমে ক্রমে **দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম** ও **কান্তপ্রেমের** কথা বলিলেন। কান্তপ্রেম অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে অপ্রাকৃত গোপীগণ যে স্বাভাবিক প্রীতি করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হয়। শান্তরসে একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠাগুণ আছে, দাস্যরসে ত' তাহা আছেই; অধিকন্তু কৃষ্ণের প্রতি মমতা বা 'আমার' বুদ্ধি আছে। আর সখ্য-রসে শান্ত ও দাস্যরসের দুই গুণ ব্যতীত আবার বিশ্রম্ভ ভাব অর্থাৎ অত্যন্ত

বিশ্বস্ততা ও আত্মীয়ভাব বিদ্যমান। বাৎসল্য-রসে শান্ত, দাস্য, সখ্যের গুণসমূহ ব্যতীত স্নেহাধিক্যের পরিমাণ অপরিমেয়। মধুর রসে ঐ চারি রসের গুণসমূহের সহিত নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এ জগতে যে রসটী আমাদের নিকট যতটা হেয় বলিয়া মনে হয়, গোলোকে তাহার বিপরীত ভাব। কেন না, এ জগৎ গোলোকের বিকৃত প্রতিবিম্ব—সমস্তই বিপরীত। যেমন দর্পণে যখন আমাদের ছবি দেখি, তখন আমাদের দক্ষিণ হস্তটি—বাম হস্ত ও বাম হস্তটি—দক্ষিণ হস্ত, এরূপ বিপরীত দেখিয়া থাকি। এই অনিত্য জগতের দর্পণে প্রতিফলিত হইলে গোলোকের রসসমূহের এইরূপ বিকৃত ছায়া দর্শন হয়।

মহাপ্রভু কান্তরসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলে রামরায় আবার কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকার প্রেমের কথা বর্ণন করিলেন। পরে রায় ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণনা করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে রামরায় বিপ্রলম্ভরসের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ * অধিরূঢ় মহাভাবময় নিজকৃত একটী গীত বলিলেন,—

---

* যাঁহারা এই জগতের চিন্তাস্রোতের অতীত রাজ্যে গিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ অকপট কৃষ্ণসেবারসে বিভাবিত, তাঁহারা শ্রীরাধার প্রেমের মধ্যে যে কি পরম বিচিত্রতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে সেই সকল সুদুর্লভ তত্ত্ব পরম মুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য বলিয়াছেন। এই সকল কথা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না, এজন্য এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা বিশেষ কৌতূহলী, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদের অমৃত-প্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য দেখিতে পারেন। গুরুপদাশ্রয় করিয়া ভজনের উন্নততম

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।

অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৯৪

রামরায় অবশেষে সেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ব্রজসখীর আনুগত্য—ইহা জানাইলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর প্রেম—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রেমসেবাতেই সেই সেই প্রেমের মূল সেবকগণের অনুগত হইতে হইবে। যেমন, কাহারও শান্তরস স্বভাবসিদ্ধ। তিনি ব্রজের গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা প্রভৃতি শান্তরসের মূল সেবকগণের অনুগত হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবেন। দাস্যরসের রসিকগণ রক্তক, পত্রক, চিত্রকের অনুগত হইয়া; সখ্য-রসের রসিকগণ সুদাম, শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণের অনুগত হইয়া; বাৎসল্য-রসের রসিকগণ নন্দ-যশোদার অনুগত হইয়া; কান্তরসের রসিকগণ ব্রজগোপীগণের অনুগত হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবেন। কেহ যদি আপনাদিগকে নন্দ-যশোদা, সুদাম, শ্রীদাম ব্রজগোপী বা রাধা মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও কৃষ্ণের সেবা ত' পাইবেনই না—অধিকন্তু তাঁহাদের ভীষণ অপরাধ হইবে—উহা সম্পূর্ণ অভক্তিমাত্র। ঘোড়া ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়ার মত ইহাই 'অহংগ্রহ-উপাসনা' বা 'মায়াবাদ'-নামে কথিত হয়। বাস্তব বৈষ্ণবধর্ম্মে বা মহাপ্রভুর শিক্ষায় কোন প্রকার কল্পনা বা আরোপের কথা নাই। পরম-মুক্ত সুনির্ম্মল চেতনের বৃত্তিতে যাহার যে স্বভাবসিদ্ধ রস আছে, তাহাই নির্ম্মল চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের বক্তব্য কথাই রামরায়ের মুখ দিয়া

সোপানে অধিষ্ঠিত না হইলে এসকল কথা বোধগম্য হয় না। অনেক মনীষী ও সাহিত্যিক এই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা বুঝিতে সমর্থ হন নাই। ইহা বলা ধৃষ্টতা হইলেও সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম। ভগবদ্ভজন ও সাধারণ সাহিত্য-সেবা বা সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার।

প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও কএকটী প্রশ্নচ্ছলে যে-সকল অমূল্য উপদেশ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। এই কয়টী শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার সার ,—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার ?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"
"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥"
"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥"
"মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥"
"শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥"
"মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি ?"
"স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"

— চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ

পঁয়তাল্লিশ

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে

এইরূপে কএকদিন প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণকথা কথোপকথনের পর শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দ রায়কে নিজের শ্যাম ও গৌররূপ (রসরাজ-মহাভাব-রূপ) দেখাইলেন। মহাপ্রভু রামানন্দকে তাঁহার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে গমন করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন এবং স্বয়ং দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থানসকলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন ও মঠাদি স্থাপন করিতেছেন। তিনি ইংরেজী ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে (১) শ্রীযাজপুরে বরাহদেবের মন্দিরে, ২৬শে তারিখে (২) শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকূর্ম্মমন্দিরে, ২৭শে তারিখে (৩) সিংহাচলম্-পর্ব্বতে শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরে, ২৯শে তারিখে (৪) গোদাবরীতটে—যেখানে রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন ও হরিকথা হইয়াছিল, সেই স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠ স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম—'কভুর'। এখানে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (৫) মঙ্গল-গিরিতে শ্রীপানা-নৃসিংহের মন্দিরেও শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মহাপ্রভু বিদ্যানগর হইতে ক্রমে গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমট, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, তিরুপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরী-তীর, কুম্ভকর্ণকপাল হইয়া পরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় দাক্ষিণাত্যবাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী, রামোপাসক, তত্ত্ববাদী, লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক রামানুজীয় বৈষ্ণবগণেরও কৃষ্ণ-ভজনে রতি হইল। বৌদ্ধস্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৌদ্ধাচার্য্য পণ্ডিতের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। ইহাতে বৌদ্ধাচার্য্য ষড়যন্ত্র করিয়া মহাপ্রভুকে মহাপ্রসাদের নামে মৎস্য-মাংসমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলে দৈবাৎ একটি সুবৃহৎ পক্ষী আসিয়া সেই অস্পৃশ্য-খাদ্যপূর্ণ থালাটি লইয়া গেল। বৌদ্ধাচার্য্যের উপরে ঐ থালাটি পড়িয়া গিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধগণ গুরুর দশা দেখিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিয়া গুরুর সহিত বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু শৈবগণকেও ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাবেরীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় জনৈক রামানুজীয় বৈষ্ণব বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক বেঙ্কট ভট্টকে সপরিবারে 'কৃষ্ণভক্ত' করিলেন। তিরুমলয়ভট্ট, বেঙ্কটভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী—এই তিন ভ্রাতা মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত হইলেন। বেঙ্কট ভট্টের ভ্রাতা প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন, ইনি বেঙ্কটের পুত্র গোপালভট্টের গুরুদেব। মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপালভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গম্ হইতে ঋষভপর্ব্বতে গমন করিয়া মহাপ্রভু তথায় শ্রীপরমানন্দপুরীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তথা হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-মথুরায় (মাদুরা) জনৈক রামভক্ত বিপ্র রাবণ জগন্মাতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে বলিয়া বড়ই দুঃখে দিন কাটাইতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে বলিলেন,—"অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ্বরী সীতাদেবীকে রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, চক্ষেই দেখিতে পায় নাই। তবে যে রামায়ণে সীতা হরণের কথা লিখিত আছে, তাহা মায়াসীতা হরণের কথা-মাত্র। রাবণ সীতার ছায়াকে সত্য সীতা মনে করিয়াছিল।" মহাপ্রভু কিছুদিন পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ কূর্ম্মপুরাণের একটি শ্লোক আনিয়া দিয়া উক্ত রামভক্ত বিপ্রকে শান্ত করিয়াছিলেন।*

---

* চৈঃ চঃ মঃ ৯।২১১-২১২

মহাপ্রভু পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে নবতিরুপতি, চিয়ড়তলা তীর্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্রমোক্ষণে বিষ্ণু, পানাগড়ী তীর্থে সীতাপতি, চাণ্ডাপুরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু, কুমারিকায় অগস্ত্য, আমলীতলায় শ্রীরাম দর্শন করিয়া মালাবার প্রদেশে আগমন করিলেন। এই স্থানে 'ভট্টথারী' বলিয়া এক শ্রেণীর লোক বাস করিত। ইহারা নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণের পুরোহিত এবং মারণ, উচাটন, ও বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্মে পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকটে রাখে এবং স্ত্রীলোকের প্রলোভনদ্বারা অপর লোককে ভুলাইয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কৃষ্ণদাস-নামক যে সরল ব্রাহ্মণটি তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি বহন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ ভট্টথারী স্ত্রীলোকের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ভট্টথারীর গৃহে আসিয়া কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে চাহিলে ভট্টথারিগণ মহাপ্রভুকে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া মারিতে গেল; কিন্তু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল তাহাদেরই গায়ে পতিত হইল। ইহাতে ভট্টথারিগণ চতুর্দ্দিকে পলাইয়া গেল। মহাপ্রভু তখন কৃষ্ণদাস বিপ্রকে কেশে ধরিয়া লইয়া আসিলেন।

জীব—চেতন, সুতরাং তাহার স্বাধীনতা আছে। যখন এই জীব স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে, তখনই সে ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট হয়; আর যখন স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করে, তখনই নানাপ্রকার অভক্তির পথে বা অসৎপথে ধাবিত হয়। সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবাভিনয় করিয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কিরূপ পতন হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু নিজ সেবক কৃষ্ণদাসের এই ঘটনাদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাপ্রভু পয়স্বিনীতীর হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা'-নামক বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রন্থের

পঞ্চম অধ্যায় সংগ্রহ করিলেন। পরে তিনি শৃঙ্গেরী মঠ ও উড়ুপীতে গমন করিলেন। উড়ুপীর তদানীন্তন তত্ত্ববাদী মধ্বাচার্য্য কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির কথা বলিলে মহাপ্রভু তাহা আদর করিলেন না। মধ্বাচার্য্য বিচারে পরাস্ত হইয়া মহাপ্রভুর মহিমা উপলব্ধি করিলেন। প্রভু শ্রীরঙ্গ-পুরীরমুখে শ্রীশঙ্করারণ্য অর্থাৎ অগ্রজ বিশ্বরূপের পাণ্ডরপুরে অপ্রকটের সংবাদ শ্রবণ করিলেন; কৃষ্ণবেন্বা নদীর তীরে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন; ফিরিবার পথে পুনঃ বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আলালনাথ হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ছয়চল্লিশ

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান

পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর সহিত শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণের পরিচয় করিয়া দিলেন। সঙ্গের সেবক কৃষ্ণদাস-বিপ্র নবদ্বীপে প্রেরিত হইলেন। কৃষ্ণদাসের মুখে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী আগমনের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইয়া অদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে আসিলেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কাশীতে চৈতন্যানন্দ-নামক গুরুর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যোগপট্টাদি গ্রহণ না করিয়া 'স্বরূপ'-নামে পরিচিত হইলেন এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দও পুরীগোস্বামীর অপ্রকটের পর গুরুর আদেশানুসারে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া মহাপ্রভুর পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে ঈশ্বরপুরীর সম্পর্কে গুরুবুদ্ধি করিতেন। একদিন মুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তিনি আমার গুরু, সুতরাং আমিই তাঁহার নিকট যাইতেছি।" ভারতীর নিকট আসিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর কখনও মৃগচর্ম্ম পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে জানিয়া, অথচ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে শাসন করা মর্য্যদার হানিকারক বলিয়া মহাপ্রভু ভারতীকে সম্মুখে দেখিয়াও বলিলেন,—"ভারতী গোসাঞি কোথায়?" মহাপ্রভুর সম্মুখেই ভারতী গোসাঞি রহিয়াছেন—ইহা মুকুন্দ মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি ভুল করিয়াছ, ইনি ভারতী গোসাঞি নহেন, ভারতী গোসাঞি কেন চর্ম্ম পরিধান করিবেন?" তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৌশলপূর্ণ উপদেশ বুঝিতে পারিলেন এবং মনে মনে বিচার করিলেন,—সত্যই ত' চর্ম্মাম্বর পরিধান দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র, উহাতে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

ভারতী সেইদিন হইতে আর মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন না,—এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও নূতন বহির্ব্বাস আনাইয়া ব্রহ্মানন্দকে পরিধান করিতে দিলেন।

ভারতী বলিলেন,—"আমি আজন্ম নিরাকার ধ্যান করিয়াছি; কিন্তু তোমার দর্শনে আজ আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইল। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও পূর্ব্বজীবনে অদ্বৈতবাদী ও নিরাকার ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু পরে গোপবধূলম্পট কৃষ্ণের কৃপায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছিলেন।"

সাতচল্লিশ

মহাপ্রভু ও প্রতাপরুদ্র

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার চেষ্টা করিলে লোকশিক্ষক গৌরসুন্দর—সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ী দর্শন নিষিদ্ধ, ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।*

—'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' ৮অঃ ২৪ শ্লোক

এদিকে রামানন্দ রায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্তভাবে অবস্থান করিবেন জানিয়া প্রতাপরুদ্র রামরায়কে কার্য্য হইতে অবসর দিয়াও পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদান করিতে থাকিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবোচিত বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিলে রাজার প্রতি মহাপ্রভুর চিত্তভাব কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর তাঁহার নবযৌবনোৎসবের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কএকদিবস তাঁহার দর্শন হয় না, এই সময়কে 'অনবসর কাল' বলে। মহাপ্রভু অনবসর সময়ে জগন্নাথ দর্শন না পাইয়া গোপীভাবে কৃষ্ণ-বিরহে আলালনাথে গমন করিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৌড়দেশ হইতে সমাগত অদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

প্রতাপরুদ্র গৌড়ীয়-ভক্তগণের বাসস্থান ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে চারি সম্প্রদায়ের বিভাগ করিয়া

---

* হায়! ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছুক ও ভগবদ্ভজনে উন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে ভোগ-বুদ্ধিতে বিষয়ী ও স্ত্রী-দর্শন বিষ ভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলকর।

সন্ধ্যাকালে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ গৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার দর্শন লাভের জন্য প্রতাপরুদ্রের প্রবল আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজার সান্ত্বনার জন্য নিত্যানন্দ-প্রভু যুক্তি করিয়া রাজাকে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত একখণ্ড বহির্ব্বাস প্রদান করিলেন। পরে রামানন্দের আগ্রহে মহাপ্রভু রাজার শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক পুত্রকে নিকটে আনাইয়া,—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—(পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন) এই বিচারে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ হইল। সেই প্রেমাবিষ্ট পুত্রকে স্পর্শ করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রেরও মহাপ্রভুর কৃপালাভ ও প্রেমোদয় হইল।

আটচল্লিশ

গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। রথযাত্রার পূর্ব্বে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা* প্রকাশ করিলেন এবং এই লীলায় সাধন-ভজনের অনেক রহস্য শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল মার্জ্জন করা প্রয়োজন। বহুদিনের সঞ্চিত নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগের অভিলাষরূপ আবর্জ্জনা-সমূহ ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া সেবাবুদ্ধির শীতল জলে হৃদয়কে

---

* শ্রীজগন্নাথদেব রথে চড়িয়া মন্দির হইতে সুন্দরাচল-নামক স্থানে 'গুণ্ডিচা'-নামক মন্দিরে গমন করেন। শ্রীক্ষেত্রকে—'কুরুক্ষেত্র' এবং সুন্দরাচলকে—'বৃন্দাবন' বিচার করা হয়। রথযাত্রাকে উড়িষ্যাবাসিগণ 'গুণ্ডিচাযাত্রা'ও বলেন। এই গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব আসিয়া নবরাত্র-লীলা বা নয়দিন ব্যাপী উৎসব করেন।

বিধৌত করিয়া নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করিতে পারিলে শ্রীজগন্নাথ-দেব তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন।”

মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয়-ভক্ত মহাপ্রভুর চরণে জল নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করায় লোকশিক্ষক প্রভু গৌড়ীয়গণের মূল মহাজন স্বরূপ-দামোদরের দ্বারা ঐ গৌড়ীয়াকে গুণ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারাও শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষা দিলেন যে, ভগবানের মন্দির-মধ্যে জীবের পক্ষে পদপ্রক্ষালন একটি সেবাপরাধ।

ঊনপঞ্চাশ

রথযাত্রা—প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের রথারোহণ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় মহারাজ প্রতাপরুদ্র একটি সুবর্ণ সম্মার্জ্জনী * দ্বারা রথগমনের পথ মার্জ্জনা করিয়া তাহাতে চন্দনজল ছড়াইতেছিলেন। মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের এইরূপ নিরভিমান সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া অন্তরে অন্তরে রাজার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু সাতটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করিলেন এবং কীর্ত্তনের মধ্যে অলৌকিক অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। যখন কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া মহাপ্রভু ‘বলগণ্ডি’ উপবনে † বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। এই সময় প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব-বেশে তথায় একাকী উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর পাদ-

---

* সোণার ঝাড়ু

† পুরীতে শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনীদেবীর স্থানের মধ্যভাগে যে ভূমিখণ্ড, তাহাকে “বলগণ্ডি” বলে।

সম্বাহন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-গীতার একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজার মুখে মহাপ্রভু কালোচিত ভাগবতীয় শ্লোক-পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা-দর্শনে মহাপ্রভু রাজাকে বিষয়ী না জানিয়া বৈষ্ণব-সেবক-জ্ঞানে কৃপা করিলেন।

জগন্নাথদেব সুন্দরাচলে বসিলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-লীলার স্ফূর্ত্তি হইল। নবরাত্র-যাত্রায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে অবস্থান করিলেন। রথদ্বিতীয়ার পরের পঞ্চমী তিথিতে যে হেরা-পঞ্চমী-উৎসব হয়, সেই উৎসব-দর্শনে মহাপ্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত ও স্বরূপ গোস্বামীর মধ্যে লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক রহস্যময় কথা হইল। মহাপ্রভু শ্রীবাসের সহিত রহস্যচ্ছলে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা, অধিক কি,—দ্বারকানাথের উপাসনা হইতেও গোপীকান্ত—শ্রীরাধাকান্তের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন। পুনর্যাত্রার (১) সময়ে কীর্ত্তনাদি হইল; কিন্তু সুন্দরাচল হইতে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ জগন্নাথের রথ টানিয়া নীলাচলে লইয়া আসিলেন না। গোপীগণ তাঁহাদের নিজের প্রাণধন কৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র লইয়া যান না।

পঞ্চাশ

গৌড়ীয় ভক্তগণ

রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে পুষ্পতুলসীদ্বারা পূজা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরও পুষ্পপাত্রের অবশেষ পুষ্প-তুলসীদ্বারা অদ্বৈতাচার্য্যকে "যোঽসি সোঽসি"-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর

(১) পুনর্যাত্রা— উল্টারথ। যখন সুন্দরাচল হইতে শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসেন।

অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসবের দিন মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গোপবেষ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমীর দিন লঙ্কাবিজয়োৎসবে মহাপ্রভু নিজ-ভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদ্রূপ অন্যান্য যাত্রা-মহোৎসবও সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয় ভক্তদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু রামদাস, দাস গদাধর প্রভৃতি কএকজন বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ ও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিতে বলিয়া দিলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তি করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে শচীমাতার জন্য প্রসাদ ও বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘব পণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, কুলীনগ্রামবাসী ভক্ত প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই বিবিধ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভু সকলকে বিদায় দিলেন এবং সত্যরাজখাঁ ও রামানন্দবসুকে প্রতিবৎসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য পট্টডোরি * আনিতে আদেশ করিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের রচয়িতা কুলীনগ্রামবাসী মালাধরবসু (গুণরাজ খান্), তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু (সত্যরাজ খান্), ইঁহার পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু—বৈষ্ণব-গৃহস্থ। রথযাত্রার পর পুরী হইতে দেশে ফিরিবার কালে ইঁহারা মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-গৃহস্থের সাধন-সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রথম বৎসর বলিয়াছিলেন,—

---

* যে-সকল ডোরি-সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ হয়। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে "পট্টডোরি" সুলভ।

—"কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন ॥" —চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪

সত্যরাজ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কি করিয়া বৈষ্ণব চিনিব? তাঁহার সাধারণ লক্ষণ কি?" মহাপ্রভু বলিলেন,—"যিনি শুদ্ধভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে একবারও কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি **কনিষ্ঠ বৈষ্ণব**। কনিষ্ঠ হইলেও ইনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবের সেবা করিবেন।"

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বৎসরেও সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু মহাপ্রভুকে আবার সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবারে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

* * "বৈষ্ণব-সেবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥" —চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০

তাঁহারা পুনরায় বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু এবার **মধ্যম বৈষ্ণবের** লক্ষণ বলিলেন,—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥" —চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২

তৃতীয় বৎসরে পুরীতে আসিয়া সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন। এ বৎসর মহাপ্রভু **উত্তম বৈষ্ণব** বা মহা-ভাগবতের লক্ষণ জানাইলেন,—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪

অর্থাৎ যাঁহার মুখে শুদ্ধভাবে একটি কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হন, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন, তিনি বৈষ্ণবতর অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অপর লোকের

মুখে কৃষ্ণনাম বহির্গত হন অর্থাৎ অপরেও ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবতম বা উত্তম বৈষ্ণব। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের মধ্যে মুকুন্দ, তাঁহার পুত্র রঘুনন্দন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরি সরকার—এই তিন জন প্রধান। মহাপ্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘুনন্দন কি তোমার পুত্র, না পিতা?" মুকুন্দ উত্তর করিলেন—"যখন রঘুনন্দন হইতেই আমার কৃষ্ণভক্তি, তখন রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র।" ইহাতে মুকুন্দ কৃষ্ণভক্ত রঘুনন্দনে পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা পরমার্থ আশ্রয় করেন, তাঁহাদের চরিত্র এইরূপ—দেহসম্পর্কে তাঁহারা কোন ব্যক্তি বা বিষয় দর্শন করেন না।

মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবদিগের সেবা-নির্দ্দেশ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতি দুই ভাইকে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ ও জলব্রহ্ম শ্রীগঙ্গার সেবা করিতে আদেশ করিয়া মুরারিগুপ্তের শ্রীরাম-নিষ্ঠা বর্ণন করিলেন।

মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত দুই ভাই চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের কৃপা-পাত্র ছিলেন। বৈষ্ণব-সেবায় বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ব্যয়বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয় সমাধানের আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট বাসুদেব দত্ত ঠাকুর অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! জগতের জীবের ত্রিতাপ-দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সকল জীবের সকল পাপ আমার মস্তকে দিয়া আমাকে নরক ভোগ করিতে দিন, আপনি সকল জীবের ভবরোগ দূর করুন।"*

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২—১৬৩

বাসুদেবের এই প্রার্থনা শুনিয়া মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। মহাপ্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ; তোমার যখন এই শুভ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা পূরণ করিবেন। ভক্তের ইচ্ছা-মাত্রেই ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে।"

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের এই প্রার্থনায় অনেক ভাবিবার কথা আছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্ট-ভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের মহামতি যীশুখৃষ্টই জগতের একমাত্র গুরু, তিনি জীবের সকল পাপের বোঝা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষগণ জগতের জীবকে তদপেক্ষা অনন্তকোটি গুণে অধিকতর উন্নত, উদার, সার্ব্বজনীন প্রেমভাব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের আদেশে একাধারে জড়ীয় স্বার্থত্যাগ-রূপ নিঃস্বার্থ, বিষ্ণুসেবারূপ চিন্ময় পরার্থ ও স্বার্থের অপূর্ব্ব সম্মেলন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জীবের শুধু পাপ নহে, সকল প্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতর, ভবরোগের মূলকারণ যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহাও নিজ-মস্তকে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের ভবরোগ মোচনের জন্য নিষ্কপটে প্রার্থনা করিয়া যে সুনির্ম্মল সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরগণেরও কল্পনার অতীত।

ই, আই, আর, লাইনে পূর্ব্বস্থলী ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি মামগাছি-গ্রামে বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল-বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান আছেন।

একাম

অমোঘ-উদ্ধার

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের একান্ত অনুরোধে তাঁহার গৃহে ক্রমে ক্রমে পাঁচদিন ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। ভট্টাচার্য্যের এক কন্যার নাম ছিল—ষষ্ঠী, ডাকনাম—"ষাঠী"। একদিন ষাঠীর মাতা অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য-পত্নী নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভুর ভোজন-সময়ে ষাঠীর স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর বিচিত্র নৈবেদ্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য লাঠি হাতে করিয়া জামাতাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, অমোঘ পলায়ন করিলে ভট্টাচার্য্য পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ষাঠীর মাতা মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া নিজ মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং "ষাঠী বিধবা হউক্" বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিশাপ দিতে লাগিলেন,—নিজের কন্যার জাগতিক সুখ-ভোগের দিকে চাহিয়াও মহাপ্রভুর নিন্দক জামাতাকে ক্ষমা করিলেন না। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহাপ্রভুকে বাসায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভট্টাচার্য্য বাড়ীর ভিতর আসিয়া স্ত্রীর নিকট অত্যন্ত খেদ করিয়া বলিলেন,—"মহাপ্রভুর নিন্দাকারীকে প্রাণে বধ অথবা আত্ম-হত্যা করিলে ব্রাহ্মণ-বধের পাপ হইবে। অতএব সেই নিন্দকের আর মুখদর্শন ও নামগ্রহণ না করাই শ্রেয়ঃ। ষাঠীর পতি 'পতিত' হইয়াছে, সুতরাং ষাঠীকে তাহার পতি পরিত্যাগ করিতে বল। পতিত স্বামীকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর এই আদর্শ-শিক্ষা আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়। জাগতিক আত্মীয়-পরিচয়ে পরিচিত অতিপ্রিয়

স্নেহভাজনগণও যদি ভক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে তাদৃশ আত্মীয়গণেরও দুঃসঙ্গ নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে ভগবানের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

পরদিন প্রাতে অমোঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইল। কৃপাময় শ্রীগৌরহরি ইহা শুনিবামাত্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আসিলেন এবং সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া অমোঘকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়া কৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

বায়ান্ন

গৌড়ীয় ভক্তগণের পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন

মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নানাভাবে ভুলাইয়া বৃন্দাবন-গমনে নিরস্ত করিলেন। ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তাধীন।

তৃতীয় বৎসরে যথাকালে শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয়ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিলেন। শিবানন্দ সেন সকলের পথের ব্যয় সমাধান করিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রতিবৎসরই নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহারই আদিষ্ট ও অভীষ্ট শ্রীনাম-প্রেম প্রচারের বার্ত্তা নিবেদন করিতেন। তাই মহাপ্রভু এবার নিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিও না, গৌড়দেশে থাকিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিও। কারণ, আমার এই দুঃসাধ্য গুরুতর কার্য্য করিবার যোগ্যপাত্র অপর কেহ নাই।"

উত্তরে নিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন,—"আমি দেহমাত্র, সেই দেহে তুমিই প্রাণ। দেহ ও প্রাণ পরস্পর অভিন্ন। সুতরাং দেহের অর্থাৎ

আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তুমি তোমারই অচিন্ত্যশক্তিতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক।” *

ইদানীং যে-সকল ব্যক্তি কল্পনা-প্রভাবে বিচার করেন যে, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গৌড়দেশে ধর্ম্মপ্রচার করায় এবং শ্রীচৈতন্যও নীলাচলে বসিয়া গৌড়দেশে প্রচারের কোন সংবাদ না রাখায় নিত্যানন্দের প্রচারিত মত শ্রীচৈতন্যের মত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের সেই ধারণার অমূলকতা ও ভ্রান্তি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হইবে।

তিপ্পান্ন

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ়সঙ্কল্প

এতদিন রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন যাইতে দেন নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরও গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রভুর আদেশে পুনরায় গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন। এবার গৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও রায়ের অনুরোধে বর্ষাকালে বৃন্দাবন যাত্রা না করিয়া পুরীতেই কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন এবং ভক্তগণের জন্য জগন্নাথের প্রসাদাদি সঙ্গে লইয়া বিজয়া দশমীর দিন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত আসিলেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে কাতর গদাধর পণ্ডিত

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৬৬-৬৭

মহাপ্রভুর সঙ্গ-লাভে ক্ষেত্রসন্ন্যাস * ত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিত গোস্বামীকে শপথ প্রদান করিয়া কটক হইতে সার্ব্ব-ভৌমের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ক্রমে উড়িষ্যার সীমাস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সীমানার পর হইতে পিছল্‌দা পর্য্যন্ত স্থানসমূহ তখন মুসলমান-রাজের অধিকারে ছিল। ভয়ে সেই পথে কেহ চলিত না। মহাপ্রভুর কৃপায় স্থানীয় মুসলমান-শাসকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করিয়া সেই মুসলমান-শাসনকর্ত্তা হিন্দু-পোষাক পরিধানপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া অশ্রু-পুলকান্বিত হইলেন ও যোড়হস্তে মহাপ্রভুর সম্মুখে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। †

পরে এই মুসলমান-শাসনকর্ত্তা মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দে গমনের জন্য নৌকা প্রদান ও অপর সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পাছে জলদস্যুগণ মহাপ্রভুর কোন ক্ষতি করে, সেজন্য সঙ্গে দশ নৌকা সৈন্যের সহিত সেই ভক্ত মুসলমান-শাসক স্বয়ং মন্ত্রেশ্বরনদ পার হইয়া পিছল্‌দা পর্য্যন্ত আসিলেন। মহাপ্রভু সেই ভক্ত মহাশয়কে পিছল্‌দায় বিদায় দিলেন এবং সেই নৌকায় চড়িয়া পানিহাটী পৌঁছিলেন। পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী হইতে ক্রমে কুমার-হট্টে শ্রীবাসের-গৃহ, তন্নিকটে শিবানন্দের গৃহ, তৎপরে বিদ্যানগরে

---

* যাঁহারা পূর্ব্ব বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ বিষ্ণুতীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, নবদ্বীপধাম বা মথুরামণ্ডলে একমাত্র ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। গদাধর পণ্ডিত ঐরূপ ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া পুরীতে টোটা-গোপীনাথের সেবা করিতেন।

† চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৮১-১৮২

বাচস্পতির গৃহ হইয়া গোপনে কুলিয়া-গ্রামে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীবাস-পণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত ও চাপাল-গোপালের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরই "কুলিয়া" বা "কোলদ্বীপ"। এই স্থানে মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমা করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" নামেও বিখ্যাত।

মহাপ্রভু অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে রামকেলিতে আগমন করিলেন। তৎকালে দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়ের বাদশাহ্ হোসেন্ শাহের রাজকার্য্য পরিচালনের দুই হস্তস্বরূপ ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু দবিরখাসকে—'শ্রীরূপ' ও সাকর-মল্লিককে—'সনাতন'-নামে প্রকাশিত করেন। হোসেন শাহ্ দবির-খাসের নিকট মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য শুনিয়া প্রভুকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' জ্ঞান করিলেন। রামকেলিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। ভক্তগণ-সহ মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর শ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। সনাতনের পরামর্শানুসারে মহাপ্রভু সেইবার বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ত্যাগ করিয়া 'কানাইর নাটশালা' হইয়া পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চুয়ান্ন

শ্রীল রঘুনাথদাস

হুগলী জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর, লাইনে ত্রিশ বিঘা রেলষ্টেশনের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম-নামক নগরের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস বাস করিতেন। ইঁহাদের রাজ-প্রদত্ত

উপাধি ছিল—'মজুমদার'। ইঁহারা কায়স্থকুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজানা-আদায় তৎকালের বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা-পাত্র ছিলেন। যখন রঘুনাথ বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, তখনই রঘুনাথ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গলাভ করেন। যে মুহূর্ত্তে রঘুনাথ গৌরসুন্দরের নাম শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য রঘুনাথ কএকবারই পুরীতে পলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গোবর্দ্ধন তাহাতে নানাভাবে বাধা দিলেন। একমাত্র পুত্র ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রঘুনাথকে সংসার-শৃঙ্খলে বদ্ধ কবিরার জন্য গোবর্দ্ধনদাস একটি পরম রূপ-লাবণ্যবতী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন, কিন্তু রঘুনাথ কিছুতেই শান্ত হইলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের উদ্‌যোগ করিয়া নীলাচল হইতে কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত আসিলেন এবং বৃন্দাবন গমনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু এই দ্বিতীয়বার শান্তিপুরে আসিলেন। সংবাদ শুনিতে পাইয়া রঘুনাথ শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। পুত্র পাছে সন্ন্যাসী হয়—এই ভয়ে গোবর্দ্ধনদাস রঘুনাথের সঙ্গে অনেক লোকজন দিলেন।

মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে এইবার সাতদিন ছিলেন। রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য রঘুনাথকে বলিলেন,—"রঘুনাথ! তুমি বাতুলতা করিও না, স্থির হইয়া ঘরে যাও। লোকে ক্রমে ক্রমেই সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে। লোক-দেখান

মর্কট-বৈরাগ্য করিও না, হরিসেবার জন্য অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর। বাহিরে লৌকিক ব্যবহার দেখাইয়া অন্তরে দৃঢ় নিষ্ঠা কর। তাহাতে অচিরে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমাগিকে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা শ্মশান বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসে ও নবীন উন্মাদনায় লোকের নিকট সম্মান পাইবার আশায় সাময়িক বৈরাগী সাজেন, তাঁহারা সেই বৈরাগ্যকে বেশীদিন রক্ষা করিতে পারেন না, শীঘ্রই "পুনর্মূষিকো ভব"-ন্যায়ে বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক মর্কট বৈরাগ্য * নিষেধের সুযোগ লইয়া চিরকালই বনিয়াদী "ঘর পাগলা" থাকাকেই 'যুক্ত বৈরাগ্য' মনে করে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই দুই প্রকার বিচারেরই নিন্দা করিয়াছেন।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়া দিলেন,—যখন তিনি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন রঘুনাথ কোন ছলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

পঞ্চাশ

মহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে—ঝারিখণ্ড-পথে

মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুদিন পুরীতে থাকিয়া

* মর্কট বৈরাগ্য—মর্কট অর্থে—বানর, বানরের ন্যায় বাহিরে ভাল মানুষটী ও ফলমূলভোজী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি বা বৈরাগ্যের ভাণ দেখাইয়া হৃদয়ে বিষয়চিন্তা ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করিবার দুরভিসন্ধি। যাহারা বাহিরে কৌপীন-বহির্ব্বাস প্রভৃতি বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিয়া হৃদয়ে বিষয়চিন্তা ও গোপনে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহারা মর্কট বৈরাগী।

একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া ঝারিখণ্ডের * বনপথে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নির্জ্জন অরণ্যমধ্য দিয়া চলিয়াছেন। পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকর—ইহাদের মধ্য দিয়াই মহাপ্রভু ভাবাবেশে চলিতেছেন, দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মহাভয় হইল। কিন্তু ঐ সকল হিংস্রজন্তু মহাপ্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন পথের মধ্যে একটি ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল। চলিতে চলিতে মহাপ্রভুর চরণ অকস্মাৎ ঐ ব্যাঘ্রের শরীরে লাগিয়া গেল। মহাপ্রভু ভাবাবেশে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছেন, সেই ব্যাঘ্রও তখন মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ লাভ করিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল! আর একদিন মহাপ্রভু এক নদীতে স্নান করিতেছিলেন, একপাল মত্ত হস্তী সেই নদীতে জল পান করিতে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু ঐ সকল হস্তীকে 'কৃষ্ণ বল' বলিয়া উহাদের গায়ে জল নিক্ষেপ করিলেন; যাহার গায়ে সেই জলকণা লাগিল, সে-ই তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলভদ্র চমৎকৃত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতেন, আর তাঁহার কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিয়া উৎকর্ণ মৃগীগণ তাঁহার নিকট ধাইয়া আসিত। মহাপ্রভু তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পড়িতেন। ব্যাঘ্র ও মৃগ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া একসঙ্গে মহাপ্রভুর

---

* মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের (Central Province) পূর্ব্বসীমান্ত জেলাগুলি লইয়া সুবৃহৎ বন্যপ্রদেশ—বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, সম্বলপুর, লাহারা, কিয়োঞ্ঝর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্ব্বত ও জঙ্গলময় স্থানকে ঝারিখণ্ড বলিত।

সহিত চলিত। এই সকল দৃশ্যে বৃন্দাবন-স্মৃতির উদ্দীপনায় মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ উচ্চারণ করিতেন। তিনি যখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ"—বলিতেন, তখন ব্যাঘ্র ও মৃগ একসঙ্গে নাচিতে থাকিত, কখনও বা পরস্পর আলিঙ্গন, কখনও বা পরস্পর মুখচুম্বন করিত। ময়ূরাদি পক্ষিগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে নৃত্য করিত। যখন মহাপ্রভু "হরি বল" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেন, তখন বৃক্ষ-লতাও সেই ধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইত। ঝারিখণ্ডের যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় আপ্লুত হইল। মহাপ্রভু যে গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেন, যে স্থানে থাকিতেন, সেই সকল স্থানের লোকের প্রেমভক্তি বিকাশ পাইত। একজন আর এক জনের মুখে—এইরূপে পরম্পরায় কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে সকল দেশের লোকই বৈষ্ণব হইয়া গেল। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-প্রভাবেই লোকসমূহ বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে চলিতেছিলেন, তখন তিনি মহাভাগবতের সর্ব্বত্র যেরূপ ব্রজলীলা-উদ্দীপনা হয়, তাহার আদর্শ প্রকাশ করিলেন,—

> বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন'।
> শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্দ্ধন'॥
> যাঁহা নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'।
> মহাপ্রেমাবেশে নাচে, প্রভু পড়ে কান্দি'॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৫৫,৫৬

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ঝারিখণ্ডের বনপথে কখনও বন্য শাক, মূল, ফল চয়ন করিয়া বন্যব্যঞ্জন পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন, কখনও বা দুই চার দিনের অন্ন পাক করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিতেন। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর উষ্ণজলে মহাপ্রভু তিন সন্ধ্যা স্নান করিতেন এবং দুই সন্ধ্যা বন্য কাষ্ঠের অগ্নিতাপে শীত নিবারণ করিতেন।

ছাপ্পান্ন

প্রথমবার কাশীতে ও প্রয়াগে

এইরূপে ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিতে চলিতে মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন ; তথায় মণিকর্ণিকায় স্নান এবং বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া কাশীবাসী তপনমিশ্রের গৃহে আগমন করিলেন। তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ (যিনি পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে পরিচিত) সেই সময় মহাপ্রভুর পাদসেবার ও উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু এইবার চারিদিন মাত্র কাশীতে অবস্থান করেন। তপনমিশ্র ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর নিকট মায়াবাদ-হলাহল-প্লাবিত কাশীর দুর্দ্দশা এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দের মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোপের বিষয় নিবেদন করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু মায়াবাদিগণের দুর্দ্দশা বর্ণনামাত্র করিয়া সেই সময়ে মায়াবাদি-গণকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অপরাধী মায়াবাদিগণের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না। তাই ইহারা 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ দেহ—দুইই একই বস্তু।"

মহাপ্রভু উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া প্রয়াগে আগমন করিলেন। প্রয়াগেও এইবারে তিন দিন মাত্র থাকিয়া কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণপূর্ব্বক মথুরার পথে লোকোদ্ধার করিতে করিতে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের ন্যায় 'পশ্চিম' দেশেও মহাপ্রভু সকল লোককে বৈষ্ণব করিলেন।

সাতান্ন

মথুরা ও বৃন্দাবনে

মহাপ্রভু মথুরার নিকট আসিয়া মথুরা দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। মথুরায় আসিয়া বিশ্রাম-ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে 'আদিকেশব' দর্শন করিলেন। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য-গান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নির্জ্জনে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য। শ্রীমাধবেন্দ্র মথুরায় আসিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে সেই ব্রাহ্মণের হস্তপাচিত অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিপ্র 'সানোড়িয়া'* ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাজন-দোষে ইঁহারা পতিত হওয়ায় তাহাদের গৃহে সন্ন্যাসিগণ কখনও ভোজন করেন না; কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার হস্তপাচিত অন্ন স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সাধারণ সামাজিক জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন। মহাপ্রভু পুরীপাদের আচারের অনুসরণে সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহাজন ও গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য—এই বৈষ্ণবাচার মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শিক্ষা দিলেন। সাধু-গণের ব্যবহারই—সদাচার।

যাঁহারা মনে করেন,—মহাপ্রভু আধুনিক জাতিভেদ-বর্জ্জনের প্রবর্ত্তক ছিলেন, অথবা যাঁহারা মনে করেন,—তিনি প্রকৃত পারমার্থিকগণের

---

* 'সানোয়াড়'-শব্দে—সুবর্ণবণিক্। তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সানোড়িয়া (বর্ণ) ব্রাহ্মণ।

সম্বন্ধেও জাতি-বিচার করিতেন,—এই উভয় শ্রেণীর ভ্রম মহাপ্রভুর এই আদর্শের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু একদিকে অপারমার্থিকগণের ব্যবহারিক জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া-না-দেওয়া-সম্বন্ধে যেমন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন, আবার তেমনি অপারমার্থিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তপাচিত কোন দ্রব্যও তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি পারমার্থিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেরই হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের অন্যান্য ঘটনাবলী আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ইহার আরও অনেক সাক্ষ্য পাইব।

মহাপ্রভু মথুরার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য উক্ত সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়া সমস্ত স্থান দেখিলেন। আরিট-গ্রামে—যেখানে অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া মহাপ্রভু তথাকার লোকগণকে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' কোথায় জিজ্ঞাসা কবিলেন; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না। সঙ্গের সানোড়িয়া ব্রাহ্মণও তাহা জানিতেন না। ইহাতে সেই তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিকটস্থ যে দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প অল্প জল ছিল, তাহাতেই স্নান করিলেন এবং সেই ধান্যক্ষেত্রই যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, তাহা জানাইলেন।

অনেক সময় আমরা সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যার বলে ভগবানের লুপ্ত-ধাম ও তীর্থসমূহ নিরূপণের চেষ্টা বা তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার তর্কের অবতারণা করিয়া থাকি; কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন,—লুপ্ত অপ্রাকৃত তীর্থসমূহ একমাত্র ভগবান্ ও একান্ত ভগবদ্ভক্তগণই বস্তুতঃ আবিষ্কার করিতে পারেন। ইহা আমাদের সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির বোধগম্য না হইলেও পরম সত্য। অন্ততঃ ইহা বুঝিবার জন্য হৃদয়কে নিরপেক্ষ ও নির্ম্মল করা আবশ্যক।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেব দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ—এই বিচারে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে উঠিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল-বিগ্রহ দর্শন করিবেন না বলিয়া মনে মনে স্থির করিলে শ্রীগোপালদেব ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হইতে গাটুলি-গ্রামে নামিয়া আসিলন। মহাপ্রভু তথায় গিয়া শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ও গোকুল প্রভৃতি দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকালের বলিয়া প্রসিদ্ধ 'চীরঘাটে' তেঁতুল-বৃক্ষের তলে বসিয়া মহাপ্রভু মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সংখ্যানাম করিতেন এবং সকলকে নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ দিতেন। অক্রূরতীর্থে কৃষ্ণদাস-নামক জনৈক রাজপুতকে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সময় হইতে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া মহাপ্রভুর কমণ্ডলু-বাহক নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে এক ধীবর কালীয়হ্রদে নৌকায় চড়িয়া মৎস্য ধরিত। তাহার নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বলিত। সাধারণ গ্রাম্যলোকগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া মনে করিল, কালীয়হ্রদে কালীয়নাগের মাথার উপর কৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। মূঢ় লোকগুলি তখন নৌকাকে 'কালীয়নাগ,' প্রদীপকে সেই নাগের মাথার 'মণি' এবং কৃষ্ণবর্ণ ধীবরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহারা এক জনরব উঠাইয়া দিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের পুনঃ আবির্ভাব হইয়াছে। সরস্বতীদেবী তাহাদের মুখে সত্যকথাই বলাইয়াছিলেন। কেন না, স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি তখন বৃন্দাবনেই বিরাজমান। তবে লোকে প্রকৃত কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই, তাহারা এক ধীবরে কৃষ্ণভ্রম করিয়াছিল। অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণ গণগড্ডলিকার

স্রোতেই গা ভাসাইয়া দিয়া গণমতকেই সত্য মনে করে। স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সরলবুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সেই জনরব শুনিয়া গণমতের (জনরবের) 'কৃষ্ণ' (?) দেখিতে ইচ্ছা হইল! কিন্তু মহাপ্রভু সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্য্যের ভ্রম নিরাস করিয়া বলিলেন,— "তুমি পণ্ডিত, তুমিও কি মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলে ?"

পরদিন প্রাতে কতিপয় লোক আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত রহস্য বলিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে বন্দনা করিলে মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য বলিলেন,—"ঈশ্বর-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব কখনও এক নহে। ঈশ্বর-তত্ত্ব যেন বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ, আর জীবতত্ত্ব ঐ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ক্ষুদ্র কণার ন্যায়। মূঢ়তাবশতঃ 'ঈশ্বর ও জীব একই' বলিলে পাষণ্ডতা-অপরাধ হয় এবং ঐ অপরাধের ফলে যমদণ্ড ভোগ করিতে হয়।"*

একশ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন,—"শ্রীচৈতন্যের অভক্তগণ যে শ্রীচৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর বলেন না, তাহা তাঁহাদের নিজেদের কল্পনা নহে, শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি-বলেই তাঁহারা ঐরূপ বলিতে সাহসী হন।" কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একটুকু গভীর ও নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায় ও তদনুগত সাধারণ লোক যে জীবকে 'ব্রহ্ম' বলেন, তাহা নিরাস করাই লোকশিক্ষক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐরূপ উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি পণ্ডিতাভিমানী বঞ্চিত লোকের নিকট আত্মগোপন করিবার জন্য ঐরূপ উক্তি করিলেও তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রাই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে,—

> "মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।
> 'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায়॥ —চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৯

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৩—১১৫

আটান্ন

"পাঠান বৈষ্ণব"

বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর অত্যধিক প্রেমোন্মাদ দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। "সোরক্ষেত্রে * গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগে যাইবেন," এই সঙ্কল্প করিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস, মথুরার সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী আর একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গাভীগণের বিচরণ দর্শন ও গোপমুখে অকস্মাৎ বংশীধ্বনি শ্রবণে মহাপ্রভুর ব্রজলীলাস্মৃতি উদিত হইয়া প্রেম-মূর্চ্ছা হইল। এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী পাঠান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে ঐরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীর সঙ্গিগণ সন্ন্যাসীর অর্থাদি কাড়িয়া লইবার জন্য সন্ন্যাসীকে ধূতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে। তাঁহাদের দলপতি বিজলী খাঁ সেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে বিজলী খাঁর দলের জনৈক মৌলানার সহিত তাঁহার কিছু কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। মহাপ্রভু কোরাণ-শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন,—

"তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১৯০

---

* বর্ত্তমানে এই সোরক্ষেত্র 'শূকরক্ষেত্র'-নামে পরিচিত। এইস্থানে শ্রীবরাহ-দেবের একটি মন্দির আছে। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিশেষ চেষ্টায় এই স্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তথায় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

উক্ত মৌলানা মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার সংস্কার সম্পাদন করিয়া তাঁহার নাম **'রামদাস'** রাখিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত অশ্বারোহিগণ সকলেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভক্ত ও "পাঠান বৈষ্ণব" নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিজলী খাঁর "মহাভাগবত" বলিয়া খ্যাতি হইল।*

উনষাট

পুনরায় প্রয়াগে—শ্রীরূপ-শিক্ষা

সোরক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রয়াগে ত্রিবেণীতে আসিলেন এবং তথায় দবিরখাস (শ্রীরূপ) ও অনুপম মল্লিককে (শ্রীবল্লভ) দেখিতে পাইলেন।

রামকেলি-গ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শনের পর হইতেই দবিরখাস ও সাকরমল্লিক দুইজনেই বিষয় ত্যাগের নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে দবিরখাস কৌশলে হোসেন শাহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু ধন-রত্ন-সহ ফতেয়াবাদে নিজ-গৃহে আসিলেন এবং সেই ধনের অর্দ্ধভাগ—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে, একচতুর্থাংশ—আত্মীয়-স্বজনকে বণ্টন করিয়া দিয়া বাকী একচতুর্থাংশ নিজেদের ভাবী বিপদুদ্ধারের জন্য রাখিয়া দিলেন। গৌড়দেশে সনাতনের নিকট দশহাজার মুদ্রা রাখিলেন। শ্রীরূপ শুনিতে পাইলেন যে, মহাপ্রভু পুরীতে গিয়াছেন এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে যাইবেন। শ্রীরূপ মহা-প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেব সঠিক তারিখ জানিবার জন্য অবিলম্বে একজন দূত পাঠাইলেন।

এদিকে সনাতন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য

* চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২১১, ২১২

শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া নিজের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছিলেন। বাদশাহ্ হোসেন শাহ্ হঠাৎ একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া সনাতনকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী রাখিলেন। শ্রীরূপের প্রেরিত চর আসিয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ দিল। শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে তখন একটি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি ও অনুপম মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেছেন, সনাতন যেন শীঘ্রই যে-কোন উপায়ে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন।

শ্রীরূপ ও অনুপম মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চলিতে চলিতে প্রয়াগে আসিলেন। তথায় মহাপ্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং একদিন মহাপ্রভু যখন এক দাক্ষিণাত্য-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য গিয়াছেন, তখন দুই ভাই নির্জ্জনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যভরে কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীরূপ এই শ্লোকটির দ্বারা মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ জানাইলেন,—সনাতন কারাগারে বন্দী আছেন। মহাপ্রভু কিন্তু বলিলেন, "সনাতন বন্ধনমুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই আমার নিকট আসিবে।"

সেইদিন মধ্যাহ্নে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন। ত্রিবেণীর উপরে মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিকটেই রূপ ও অনুপম বাসা করিলেন। এই সময় শ্রীবল্লভ ভট্ট (পরবর্ত্তিকালে বল্লভাচার্য্য-নামে বিখ্যাত) আড়াইল-গ্রামে* বাস করিতেন। মহাপ্রভুর প্রয়াগে আগমনের

* আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক বা 'গাদি' এখনও বর্ত্তমান আছে। যে-স্থানে এই গাদি অবস্থিত, সেই পল্লীর নাম 'দেওরখ'। 'দেওরখ' নৈনী ষ্টেশন

সংবাদ শুনিয়া বল্লভ ভট্ট তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অনেক হরিকথা শ্রবণ করিলেন। বল্লভ ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার অপর পারে আড়াইল-গ্রামস্থ স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং সবংশে তাঁহার পাদোদক-গ্রহণ ও পূজা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তথায় মিথিলাবাসী রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর অনেক রসালাপ হইল।

বল্লভ ভট্ট তাঁহার পুত্রকে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ দেখিয়া তাঁহাকে প্রয়াগে লইয়া গেলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে দশ দিন থাকিয়া দশাশ্বমেধঘাটে নির্জ্জন স্থানে শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক সূত্ররূপে সমগ্র ভক্তিরসতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং সেই সূত্র-অবলম্বনে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থ রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই,—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বদ্ধজীব চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম—দুইটি প্রধান শ্রেণী। জঙ্গম আবার তিন প্রকার—জলচর, স্থলচর ও খেচর। ইহাদের মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবজাতির সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্প। মানবগণের মধ্যে আবার অসভ্য, অসদাচারী ও নাস্তিক ব্যক্তি অনেক। ইহা ছাড়া যাঁহাদিগকে সদাচারী ও বেদনিষ্ঠ বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক কেবল মুখে বেদ স্বীকার করেন। ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অধিক সংখ্যকই কর্ম্মী, কোটি কর্ম্মীর মধ্যে একজন

হইতে আড়াই মাইল। যাঁহারা প্রয়াগ হইতে এই স্থান দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে যমুনা পার হইতে হয়। বিশেষ বিবরণ 'গৌড়ীয়' নবম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় 'আড়াইল-গ্রাম'-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটিজন জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পুরুষ পাওয়া যায়। আবার এইরূপ কোটি মুক্তপুরুষের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত; কর্ম্মীই হউন, আর জ্ঞানীই হউন, বা যোগীই হউন, ইঁহারা সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে আত্মসুখের জন্য কিছু-না-কিছু চাহেন, তাই তাঁহারা অশান্ত।

জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। জীব পূর্ণ চেতনের কণা; কিন্তু বর্ত্তমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম (দেহ এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার) দুইটি আবরণে তাহার স্বরূপ আবৃত। এইরূপ কোন জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি অকস্মাৎ কোন সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তবেই সেই জীব সদ্‌গুরুর সন্ধান পায় এবং সদ্‌গুরু ও কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তিলতার বীজ পাইতে পারে। তাঁহাদের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণের দ্বারাই ঐ বীজ লাভ হয়। সেই বীজ পাইয়া সাধক জীব মালীর ন্যায় আপন হৃদয়-ক্ষেত্রে উহা রোপণ করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুক্ষণ শ্রবণ ও পরে সেই কথা কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে করিতে ভক্তিলতা-বীজকে অঙ্কুরিত করিতে পারেন। সেই ভক্তিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর মধ্যে আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের পরে 'বিরজা-নামে' এক নদী আছে, সেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর দ্বন্দ্ব নাই—সকলের শান্ত ভাব। বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোক। নিরাকার ধ্যানকারিগণ এবং ভগবানের হস্তে নিহত ভগবদ্-বিদ্বেষিগণ এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ইহারও ঊর্দ্ধে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম বা বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের উপাসকগণ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করেন। ইহারও উপরে গোলোক-বৃন্দাবন। সেখানে কৃষ্ণচরণ-

কল্পতরু আছে। ভক্তিলতা সেই কল্পতরুকে আশ্রয় করিলে তখন ভক্তি-লতায় প্রেমফল ধরে। কিন্তু প্রেমফল ফলিলেও ভজনকারী মালী তখনও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন-কার্য্য বন্ধ করেন না।

এইরূপ সাধন করিতে করিতে যদি অতীব দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধরূপ মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মত্তহস্তী ভক্তিলতার মূলপর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে,—লতা শুকাইয়া যায়। এজন্য সাধক মালীর সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিয়া যত্ন-সহকারে ভক্তি-লতার চতুর্দ্দিকে আবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন বৈষ্ণবাপরাধ-হস্তী কোনরূপে লতার নিকটে আসিতে না পারে।

লতার সঙ্গে সঙ্গে যদি উপশাখা-সকল (যাহা দেখিতে লতার ন্যায় অর্থাৎ ভক্তির ন্যায়, অথচ বস্তুতঃ অবান্তর পদার্থ) উঠিতে থাকে, তাহা হইলে জলসেচনের অর্থাৎ সাধন-ভজনের বাহ্য-অভিনয়-দ্বারা উপশাখা-গুলিই বাড়িয়া যায়। সেই উপশাখার বহু প্রকারভেদ আছে। তন্মধ্যে ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-আচার, কপটতা, জীবহিংসা, স্ত্রী-অর্থ প্রভৃতি লাভের জন্য চেষ্টা, লোকের নিকট হইতে পূজা ও সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রধান। সাধক প্রথমে এই সকল উপশাখা-গুলিকে ছেদন করিবেন, তাহা হইলেই মূলশাখা বৃদ্ধি পাইয়া তাহা গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাদপদ্ম-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিবে।

কৃষ্ণপ্রেমের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তৃণতুল্য। ভোগ বা মোক্ষের উদ্দেশ্যে দেবতা-সকলের পূজা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবা—অন্য সমস্ত অভিলাষ, কর্ম্মচেষ্টা ও জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধভক্তি। এই শুদ্ধভক্তি হইতেই 'প্রেমা' উৎপন্ন হয়। ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছা যদি বিন্দু-মাত্রও অন্তরে থাকে, তবে কোটিজন্ম সাধনেও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। প্রেমভক্তি আবার যখন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে, তখন তাহা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়।

ইহার পর মহাপ্রভু বিভিন্ন রসের তারতম্য ও সেবার গাঢ়তার তারতম্যের কথা বর্ণন করিলেন। শ্রীরূপকে প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া মহাপ্রভু কাশীতে গমন করিলেন এবং তথায় চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসস্থান স্থির করিলেন।

ষাট

কাশীতে—শ্রীসনাতন-শিক্ষা

শ্রীসনাতন যখন হোসেন শাহের বিরাগ-ভাজন হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, তখন তিনি শ্রীরূপের নিকট হইতে পত্র পাইলেন। পত্র পাইবার পর সনাতন কারারক্ষককে নানা চাটুবাক্যে ভুলাইয়া ও তাহাকে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া কারামুক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম-পূর্ব্বক কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু গৃহদ্বারে সনাতনের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকাইলেন এবং তাঁহার ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া ও মলিন অভদ্র-বেষ ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-বেষ পরিধান করাইলেন। সনাতন চন্দ্রশেখরের প্রদত্ত নুতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রসাদী একটি পুরাতন ধুতি লইয়া তাহা দ্বারা দুইটি বহির্ব্বাস ও কৌপীন করিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী সনাতনকে তাঁহার কাশীতে থাকা-কালে নিজ-গৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সনাতন এক স্থানে

ভিক্ষা করিবার পক্ষপাতী না হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মাধুকরী* করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ছদ্মবেশে বৈরাগ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু গৌড়দেশ হইতে সনাতন পলাইয়া আসিবার সময় পথে হাজীপুরে তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হইতে প্রাপ্ত একটি ভোটকম্বল তাঁহার গায়ে ছিল। মহাপ্রভু ঐ কম্বলের প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মধ্যাহ্নে স্নানকালে গঙ্গার ঘাটে বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিজ বহুমূল্য সেই ভোট-কম্বলখানি প্রদান করিয়া উহার বদলে সেই ব্যক্তির কাঁথাখানি গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে সনাতন তাঁহার নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া জীবের স্বরূপ, কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই **'সনাতন-শিক্ষা'** নামে বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক-সিদ্ধান্ত সনাতনশিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব জীব ও জড়জগতের সহিত ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। জীব তাহার নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-নির্ম্মল স্বরূপে সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব—সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের কিরণকণা-স্থানীয়। কিরণ-কণাকে যেরূপ স্বয়ং সূর্য্য বলা যায় না, আবার তাহা যেমন সূর্য্য হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, তদ্রূপ জীবও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম নহে, আবার কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে।

কিন্তু যে-সকল জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই মায়া এই সংসারে সুখ-দুঃখ দিতেছেন।

---

* মধুকর বা ভ্রমর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া আহার করে, তদ্রূপ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ এক স্থানে কোন বিষয়ী বা দাতার রাজসিক নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বার হইতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। জল ও স্থল—এই উভয়ের মধ্যে যে একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা (Demarcation line) আছে, তাহাকে তট বলে। তট ভূমিও বটে, জলও বটে অর্থাৎ উভয়স্থ। জীব চেতন পদার্থ, চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই—স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি চেতনমাত্রেই আছে, তবে সেই চেতন পূর্ণচেতনের অণু-অংশ বলিয়া তাহার স্বতন্ত্রতাও খুব সসীম। কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণচেতন বলিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা অসীম ও মানবের চিন্তার অতীত; সেই হেতু তিনি অবাধ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্। জীবের শুদ্ধ চেতনস্বরূপ বর্ত্তমানে দুইটি আবরণদ্বারা আবৃত। একটি স্থূলদেহ—যাহা আমরা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করি, আর একটি—মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম শরীর, ইহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি। জীব যখন তাহার সেই স্বাধীনতার সামান্য অধিকার-টুকুর সদ্ব্যবহার করে, তখন সে ভগবানের সেবাতে উন্মুখ ও অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবার পরম চমৎকারিতা ও নিত্য আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে। কিন্তু যখন সে সেই স্বতন্ত্রতাটুকুর অপব্যবহার করে, তখনই সে তটের অপর পারে অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়। এইরূপ যাহারা অনাদিকাল হইতে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একমাত্র প্রভু কৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্যই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। সাধু-শাস্ত্রের কৃপায়ই কৃষ্ণকে জানিবার ইচ্ছা হয়। যেমন লোক দৈবজ্ঞের নিকট পিতৃ-ধনের সন্ধান পাইয়া প্রকৃত স্থান হইতে ধন তুলিয়া আনে, সেইরূপ সাধু-শাস্ত্র-গুরু হইতে কৃষ্ণভক্তির ঠিক সন্ধান পাইলে ও তদনুযায়ী সাধন করিলে গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় জীবের প্রেমধন লাভ হয়।

কৃষ্ণই—পরম-তত্ত্ব; ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গ-জ্যোতিঃ। সূর্য্যকে যেরূপ আমরা পৃথিবী হইতে কেবল জ্যোতির্ম্ময় দেখি, কিন্তু যাঁহারা সূর্য্যলোকে

বাস বা সূর্য্যের নিকটে গমন করিতে পারেন, তাঁহারা সূর্য্যকে অবয়বযুক্ত দেখেন ; তদ্রূপ কৃষ্ণের অসম্যক্ দর্শনে অর্থাৎ বাহিরের অঙ্গজ্যোতিঃমাত্র দর্শনে তাঁহাকে কেবল জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া ধারণা হয়। যোগিগণ কৃষ্ণকে যে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাহাও কৃষ্ণ-সম্বন্ধে আংশিক দর্শন—কৃষ্ণের বৈভব-দর্শন-মাত্র।

কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত ; কিন্তু সেই শক্তির ত্রিবিধ পরিজ্ঞান মুখ্য-ভাবে প্রসিদ্ধ। প্রথম—তাঁহার বাহিরের অঙ্গের শক্তি, দ্বিতীয়—তাঁহার অন্তর বা ভিতরের অঙ্গের শক্তি এবং তৃতীয়—তাঁহার বাহির ও অন্তর এই দুই অঙ্গের সন্ধিস্থলরূপ তটে অবস্থিত শক্তি। বাহিরের অঙ্গের শক্তি হইতে এই দৃশ্যমান জড়জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তর-অঙ্গের শক্তি হইতে ভগবানের নিজের ধাম ও তাঁহার সেবকগণ প্রকাশিত হইয়াছেন, আর তটস্থা-শক্তি হইতে জীবসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, সেই জ্ঞানের নাম **সম্বন্ধজ্ঞান**। জীবের যাহা নিত্য স্বভাব, তাহা প্রকট করার নামই সাধন, তাহাই **অভিধেয়**। সেই সাধনদ্বারা জীব যে ফল লাভ করিতে পারে, তাহাই জীবের **প্রয়োজন**। কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্য প্রভু-সেবক সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-সেবাই জীবের অভিধেয় এবং পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনই সেই সেবারূপ সাধনের ফল,—ইহাই প্রয়োজন বা **কৃষ্ণপ্রেম**। সাধনের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, সাধু বা ভগবানের বাসস্থলীতে বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা—এই পাঁচটী অঙ্গই মুখ্য।

সাধনভক্তি দুই প্রকার,—**রাগানুগা ভক্তি** ও **বৈধী ভক্তি**। ব্রজগোপীগণ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, রক্তক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত ভগবান কৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে **রাগাত্মিকা** সাধ্য ভক্তি বলে। সেই রাগাত্মিকা ভক্তিতে

যাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ হয়, তাঁহারা সেই সকল ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া কৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। আর যাঁহারা শাস্ত্রের শাসন বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা শাসিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার জন্য সাধন করেন, তাঁহাদিগের সেই সাধন-চেষ্টাকে বৈধী ভক্তি বলা হয়।

অন্তরে আদৌ শ্রদ্ধার উদয় হইলে জীব সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ের নানাপ্রকার কামনা-বাসনা, দুর্ব্বলতা, অপরাধ, নিজের স্বরূপের ভ্রান্তি প্রভৃতি অনর্থসমূহ দূর হয়। এই অবস্থার নাম—অনর্থ-নিবৃত্তি। ইহার পরে নিষ্ঠার উদয় হয় অর্থাৎ ভগবানের সেবায় সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়। পরে সেই সেবায় স্বাভাবিক রুচি ও তৎপরে আসক্তি জন্মে। এই পর্য্যন্ত **সাধনভক্তি**। ইহার পর কৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুর বা **ভাবের** উদয় হয়। এই ভাব ক্রমশঃ পরিপক্ব হইয়া **প্রেমরূপে** প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেম-লাভের ইহাই ক্রম।

সনাতনের প্রার্থনানুসারে মহাপ্রভু কাশীতে "আত্মারাম"শ্লোকের একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস' রচনার জন্য আদেশ করিয়া উহার বিষয়-সকল সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

একষট্টি

প্রকাশানন্দ-উদ্ধার

একদিন চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র অত্যন্ত দুঃখের সহিত মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) সর্ব্বক্ষণ নিন্দা করিয়া অপরাধে মগ্ন হইতেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ

আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—"আমার গৃহে আজ আমি কাশীর সকস সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার গৃহে একবার পদার্পণ করেন, তবে আমার অনুষ্ঠান পূর্ণ ও সফল হয়। আপনি কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশেন না, ইহা আমি জানি। তথাপি আজ আমার প্রতি একবার কৃপা করুন।"

ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সেই বিপ্র-গৃহে সন্ন্যাসিগণের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, সকলকে নমস্কার করিয়া বাহিরে গিয়া পদ প্রক্ষালন করিলেন এবং সেই স্থানেই বসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ গৌরসুন্দরের মহাতেজোময় রূপ দেখিয়া স্ব-স্ব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দও মহাপ্রভুকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তম স্থানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং হাতে ধরিয়াই বিশেষ সম্মানের সহিত সভার মধ্যে বসাইলেন।

প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত না মিশার জন্য অনুযোগ করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে মূর্খ ও 'বেদান্তে' অনধিকারী দেখিয়া শাসন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনাম জপ করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে' কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ

ইহা দ্বারা মহাপ্রভু ইঙ্গিত করিলেন যে, যাঁহারা আপনাদিগকে বেদান্তে অধিকারী অভিমান করিয়া হরিনামকে অনিত্য বিচার করেন, বস্তুতঃ তাঁহারাই বেদান্তে অনধিকারী। সকল বেদ-মন্ত্রের সার ও সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম—শ্রীনাম। এই জন্যই বেদমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবের (ওঁ) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বেদান্তসূত্রেরও আদিতে এবং অন্তে এই শব্দব্রহ্ম বা প্রণব রহিয়াছেন। বেদান্তের ফলপাদের প্রথম সূত্র—"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ও চরম সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই নামের অনুক্ষণ আবৃত্তি ও তদ্দ্বারাই সংসারে অ-পুনরাবৃত্তি উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা জীবের সংসার-মোচন এবং নামের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। এই কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি-আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ

মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—বেদান্ত ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে সবিশেষ-স্বরূপ ভগবানকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব—শক্তি ; কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্। জীবের স্বরূপ স্ফুলিঙ্গ কণার মত ক্ষুদ্র। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বা ধামকে প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত জড় মনে করার ন্যায় নাস্তিকতা আর কিছুই নাই। বেদান্তে শক্তিপরিণামবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি চিন্তামণির রত্ন-প্রসবের ন্যায় এই জড়জগৎ প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে। আচার্য্য শঙ্কর বেদ হইতে যে চারিটি মহাবাক্য চয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বেদের

সার্ব্বদেশিক বিচার পাওয়া যায় না। বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবান্‌কে কেবল নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাঁহার নিত্যশক্তি স্বীকার না করিলে ভগবানের অর্দ্ধস্বরূপমাত্র স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রকৃত পূর্ণতা অস্বীকার করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যের কৃপায় মায়াবাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। কাশীতে একদিন মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবিন্দুমাধবের মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্য প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া নিজের পূর্ব্ব কার্য্যের জন্য আপনাকে ধিক্কার করিয়া বেদান্তসঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া জানাইলেন।

ইহার পরে মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও অনুপমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বাষট্টি

সুবুদ্ধিরায়

সুবুদ্ধিরায় নামক এক ব্যক্তি হোসেন শাহের পূর্ব্বে 'গৌড়ে'র অধ্যক্ষ ছিলেন। হোসেন শাহ্ তখন সুবুদ্ধিরায়ের অধীন কর্ম্মচারী। এক সময় তিনি হোসেন শাহ্‌কে চাবুক মারিয়া শাসন করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ্ যখন গৌড়ের রাজা হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়কে জাতিভ্রষ্ট করেন। সুবুদ্ধিরায় কাশীর পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সুবুদ্ধিরায়কে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন। মহাপ্রভু যখন

কাশীতে আসিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় মহাপ্রভুর নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু পণ্ডিতগণের ঐসকল ব্যবস্থায় কোন বাস্তব কল্যাণ-সম্ভাবনা নাই জানাইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিলেন,—

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সুবুদ্ধিরায় বৃন্দাবনে আগমন করেন ও বৈরাগ্যপূর্ণ হরিভজনময় জীবনযাপন করিতে থাকেন। সুবুদ্ধিরায় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সহিত বৃন্দাবনের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

তেষট্টি

পুনরায় নীলাচলে

মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিবানন্দসেনের সহিত একটি ভগবদ্ভক্ত কুক্কুরও পুরী অভিমুখে আসিতেছিল। একদিন শিবানন্দ সেনের ভৃত্য কুক্কুরকে রাত্রিতে ভাত দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কুক্কুরটি কোথায় চলিয়া গেল—কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে ভক্তগণ পুরীতে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—সেই কুক্কুরটি মহাপ্রভুর সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া আছে। মহাপ্রভু কুক্কুরটিকে নারিকেলশস্য-প্রসাদ ফেলিয়া ফেলিয়া

দিতেছেন ও 'রাম, কৃষ্ণ, হরি বল' বলিতেছেন। কুকুরটি মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রসাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছিল। ইহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন, শিবানন্দ সেনও দণ্ডবৎ করিয়া কুকুরের নিকট নিজের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহার পরে সেই কুকুরকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। কুকুর সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আসিয়া ঠাকুর হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু একদিন শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটী দেখিতে পাইয়া এবং আর একদিন শ্রীরূপের "ললিত-মাধব" ও "বিদগ্ধমাধব" নাটক গ্রন্থের শ্লোক শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

ভগবান্ আচার্য্য নামক এক সরল ব্রাহ্মণ পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে মায়াবাদি-গণের নিকট বেদান্ত পড়িয়া পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। মহা-প্রভু তাঁহাকে বাহিরে শিষ্টাচার দেখাইলেও অন্তরে আদর করিলেন না।

চৌষট্টি

ছোট হরিদাস

একদিন ভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখিমাহিতির ভগ্নী মাধবীদেবীর নিকট গিয়া মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিছু সরু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। মাধবীদেবী বৃদ্ধা, তপস্বিনী ও পরমা বৈষ্ণবী। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন জন শ্রীরাধিকার গণ ছিলেন; এক—স্বরূপ গোস্বামী, দুই—রায় রামানন্দ, তিন—শিখিমাহিতী এবং অর্দ্ধেক—তাঁহার ভগ্নী মাধবীদেবী, অর্থাৎ মাধবী দেবীও রাধিকার গণের মধ্যে গণিত ছিলেন।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে আসিয়া ভোজনকালে উত্তম সরু চাউল কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ছোট হরিদাস ঐ চাউল মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আদেশ করিলেন,—"ছোট হরিদাসকে এখানে আর আসিতে দিও না। তুমি আজ হইতে আমার এই আদেশ পালন করিবে।"

হরিদাস তাঁহার দ্বার-মানা হইয়াছে শুনিয়া মনের দুঃখে উপবাসী থাকিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ ছোট হসিদাসের অপরাধের বিষয় জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

* * বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥—চৈঃ চঃ অঃ ২ পঃ

অন্যদিন পরমানন্দপুরী শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পুরীত্যাগ করিয়া আলালনাথে * গমনের ভয় প্রদর্শন করিলেন। একটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীমন্ মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর

---

* আল্ বরনাথ-শব্দের অপভ্রংশ—আলালনাথ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ে প্রাচীন সিদ্ধপার্ষদ মহাপুরুষগণ 'আল্‌বর'-শব্দে অভিহিত হন। আল্‌বরগণের নাথ চতুর্ভুজ-বিষ্ণুমূর্ত্তি এখানে বিরাজিত আছেন। ১৪৩২ শকাব্দায় মহাপ্রভু প্রথমবার এখানে পদার্পণ করেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এখানে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে।

সেবাপ্রাপ্তি সঙ্কল্প করিয়া প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীর জলে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরবর্ত্তী চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরীতে আসিবার পর মহাপ্রভুর নিকট হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, —এইমাত্র উত্তর দিলেন। শ্রীবাস তখন ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের বৃত্তান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥ —চৈ: চঃ অঃ ২।১৬৫

ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলাদ্বারা মহাপ্রভু গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। নেড়ানেড়ী, অসচ্চরিত্র ও গোপনে ব্যভিচার-পরায়ণ, বৈষ্ণববেষধারী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাঁহারা মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তধারণা মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-দণ্ড-লীলাদ্বারা সংশোধিত হওয়া উচিত। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বৈষ্ণবতা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যত্বও লাভ করে নাই,—ইহা সামাজিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন।

পঁয়ষট্টি

নীলাচলে বিবিধ শিক্ষা প্রচার

পুরীতে কোন সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ-যুবতির একটি অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকটে আসিতে দেখিয়া এবং মহাপ্রভু ঐ বালককে স্নেহ করেন দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত* মহাপ্রভুকে কহিলেন,—"বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রের সন্দেহ করিবে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু একদিন

* শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও দামোদর পণ্ডিত দুইজন পৃথক ব্যক্তি। এই দুই জনই মহাপ্রভুর ভক্ত।

দামোদরকে নবদ্বীপে শচীমাতার তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, সাধক-জীবের যে শাসন প্রয়োজন, সিদ্ধপুরুষ বা ভগবানকে সেইরূপ শাসনের অধীন করিলে কেবল ভুল নহে, তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়।

সনাতন গোস্বামী মথুরামণ্ডল হইতে ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরীতে আসিলেন। কৃষ্ণ-বিরহের আতিশয্যে তিনি রথচক্রের নীচে পড়িয়া শরীর পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেহত্যাগে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—ভক্তি।

মহাপ্রভু সাধক জীবের জন্য এই শিক্ষা দিলেও প্রেমী ভক্ত সনাতনের দেহত্যাগের তাৎপর্য্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬২

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে জীবের জন্য আরও অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ

শ্রীগৌরসুন্দর সনাতনের দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার প্রভৃতি অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিবেন—জানাইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতনকে সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রাখিয়া পরের বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীহট্ট-নিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র গৌরসুন্দরের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, গৌরসুন্দর তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। রামানন্দের গৃহে গমন করিয়া প্রদ্যুম্ন জানিতে পারিলেন যে, রামানন্দ দেবদাসীগণকে * নির্জ্জন উদ্যানে তাঁহার নিজের কৃত 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'র গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। রামানন্দ রায় ছিলেন—ব্রজ-লীলায় শ্রীমতীর নিজ-জন। গৌর-লীলায় তিনি পরম মুক্ত বিজিতেন্দ্রিয়-গণের শিরোমণির আদর্শ লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সাধারণ বদ্ধ বা সাধক জীব ছিলেন না। কিন্তু প্রদ্যুম্নমিশ্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া রামানন্দের এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের পরম মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্রের ভ্রান্তি দূর করিলেন। অতঃপর মিশ্র পুনরায় রামানন্দের নিকট গিয়া অনেক তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভু যে-কোন কবি বা সাহিত্যিকের কবিতা বা সাহিত্য শুনিতে পারিতেন না। যে-সকল কবিত্বে ও সাহিত্যে তত্ত্ববিরোধ ও রসের বিপর্য্যয় আছে, তাহা মহাপ্রভুর নিকট বড়ই অপ্রীতিকর ও অসহ্য হইত। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাই এই কথার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারাও যে-কোন কবির তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস-দুষ্ট কাব্য, গান ও সাহিত্য কখনও শুনিতে পারেন না, তাহা তাঁহাদের নিকট অসহ্যকর বোধ হয়। অথচ ইহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

প্রথমে শ্রীস্বরূপ-দামোদর পরীক্ষা করিয়া দিলে পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেন। বঙ্গদেশীয় এক কবি মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইবার ইচ্ছা করিলে

* চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩-১৪

প্রথমে স্বরূপ গোস্বামি-প্রভু তাহা শুনিলেন। সভাস্থ সকলেই এই নাটকের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু স্বরূপগোস্বামী তাহাতে মায়াবাদ-দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা তিনিই বর্ণনা করিতে পারেন,—যিনি গৌর-পাদপদ্মকে জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়াছেন। তাহা বর্ণনা করিবার যোগ্যতা গ্রাম্য কবি ও সাহিত্যিকগণের হয় না।

আধুনিক কালে অনেকের ধারণা—লৌকিক সাহিত্য ও কাব্য রচনায় পারদর্শিতা লাভ করিলেই কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা বর্ণনা করিবার যোগ্যতা হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, একান্ত ভগবদ্ভক্তের চরণে শরণ গ্রহণ না করিয়া, একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় না করিয়া এবং সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যভক্তগণের সঙ্গ না করিয়া শ্রীচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সাহিত্য ও গ্রন্থাদি রচনা করিবার চেষ্টা কেবল ধৃষ্টতা নহে,—তাহাতে শিব গড়িতে বানরই গঠিত হইয়া পড়ে।*

শ্রীস্বরূপ-দামোদরের এই উপদেশে সেই কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভগবদ্ভক্তগণের চরণে আত্মসমর্পণ এবং মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এই অবস্থায় রামানন্দের কৃষ্ণকথা ও স্বরূপের কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল।

এদিকে মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী শ্রীরঘুনাথ দাস গৃহে ফিরিয়া গিয়া বাহিরে বিষয়ী লোকের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। সপ্তগ্রামের কোন মুসলমান

* চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯১-১৫৮

জমিদার নবাবের উজীরের সাহায্যে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসকে নির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহারা পলাইয়া গেলেন। রঘুনাথের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পাণিহাটীতে গিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় তথায় এক দধি-চিড়া-মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দ-প্রভু রঘুনাথকে কৃপা করিয়া চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঘুনাথ সেই রাত্রিতে যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং তাঁহার সহিত কিছু দূর গিয়া একাকী গুপ্তপথে বার দিনে পুরীতে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া স্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ পাঁচ দিন মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তি * অবলম্বন করিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু রঘুনাথের এই বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

> বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
> শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥
> জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
> শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥—চৈঃ চ: অঃ ৬ পঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ প্রত্যেক হরিভজনকারী ব্যক্তিরই বিশেষ-ভাবে পালনীয়। রঘুনাথ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণ

---

* নিজে যাচ্ঞা করিয়া ভিক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে কেহ নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু দিবেন, সেই আশায় বসিয়া থাকিয়া ভিক্ষা করাকে অযাচক-বৃত্তি বলে।

করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু রাগানুগ * ভক্তের পালনীয় আচার সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥—চৈঃ চঃ অঃ ৬ পঃ

গোবর্দ্ধনদাস পুত্র রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া পুরীতে রঘুনাথের নিকট লোক ও অর্থ পাঠাইলেন; কিন্তু রঘুনাথ তাঁহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। প্রতিমাসে মহাপ্রভুকে দুইবার নিমন্ত্রণ করিবেন, এজন্ত রঘুনাথ প্রেরিত অর্থের কিছু গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিষয়ীর দ্রব্য-গ্রহণে মহাপ্রভুর প্রীতি হয় না এবং নিমন্ত্রণকারীর কেবল সম্মান-লাভই ফল হয়, এই বিচার করিয়া অবশেষে গোবর্দ্ধনের অর্থের দ্বারা মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-সেবাও পরিত্যাগ করিলেন।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮

কিছুদিন পরে রঘুনাথ সিংহদ্বারে অযাচক বৃত্তিও পরিত্যাগ করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার।—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪

বেশ্যা যেরূপ পরপুরুষের আশায় দ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকে, ভিক্ষা-প্রাপ্তির লোভে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকাও তদ্রূপ। রঘুনাথ

---

* রাগানুগ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ সেবক ব্রজগোপী, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম বা রক্তক-পত্রক-চিত্রকের কৃষ্ণসেবায় লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের অনুগতভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।

মাধুকরী ভিক্ষা করিতেছেন শুনিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার নিজের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা রঘুনাথকে দান করিলেন। ইহার পর রঘুনাথ পথে পরিত্যক্ত ও পর্য্যুষিত (বাসি) মহাপ্রসাদ জলে ধৌত করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও স্বরূপ ইহাতে অধিক সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া আস্বাদন করিলেন।

ছয়ষট্টি
পুরীতে শ্রীবল্লভ ভট্ট

শ্রীবল্লভ ভট্ট একবার রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীতে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রণত হইলেন। বল্লভ ভট্ট গৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন; কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত অপর কেহ তাহা প্রচার করিতে পারেন না। আপনি কৃষ্ণশক্তিধর; তাই আজ আপনার কৃপায় জগতে কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইতেছে।" মহাপ্রভু তখন দৈন্যভরে নিজের অযোগ্যতা প্রকাশপূর্ব্বক নিত্যানন্দ,অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বল্লভ ভট্টের নিকট আত্মগোপন করিলেন।

আর একদিন বল্লভ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টের হৃদয়ের যশোলিপ্সা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। কৃষ্ণ—শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন,—এই মাত্র জানি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও শ্রীবল্লভ ভট্টের নানাপ্রকার তত্ত্ববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলেন। একদিন বল্লভ ভট্ট শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীব—প্রকৃতি, আর কৃষ্ণ—পতি। অতএব পতিব্রতা-স্বরূপ জীব কিরূপে

অপরের নিকট পতিস্বরূপ কৃষ্ণের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারে?” অদ্বৈতাচার্য্য বল্লভ ভট্টকে সাক্ষাৎ ‘ধর্ম্মবিগ্রহ’ মহাপ্রভুর নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—“স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনই পতিব্রতার ধর্ম্ম; পতি যখন নিরন্তর তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বলিয়াছেন, তখন পতিব্রতা তাঁহার স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না।”

আর একদিন বৈষ্ণব-সভায় শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রীধরস্বামীর টীকা খণ্ডন করিয়া একটি নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু রহস্যচ্ছলে শ্রীবল্লভ ভট্টের ঐরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

—“স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১১

শ্রীগৌরসুন্দর বল্লভ ভট্টকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—“জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামীর প্রসাদেই আমরা ভাগবত জানিতে পারি। তিনি ভক্তির একমাত্র রক্ষক। গুরুর উপরে গুরুগিরি করিতে যাওয়া ভীষণ অপরাধ। শ্রীধরের অনুগত হইয়া ভাগবত ব্যাখ্যা কর, অভিমান ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন কর, অপরাধ ছাড়িয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন কর, তবেই কৃষ্ণচরণ পাইবে।” কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অনুমতি লাভ করিয়া বল্লভ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী হইতে কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

বল্লভভট্টের ন্যায় পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিরও শ্রীধর স্বামীকে ‘মায়াবাদী’ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন—তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী।

সাতষট্টি

রামচন্দ্র পুরী

রামচন্দ্র পুরী নামক এক সন্ন্যাসী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার শুদ্ধভক্তির কোন বিচার ছিল না। অন্তর্দ্ধান-সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্র পুরী শ্রীমাধবেন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিদ্ হইয়া কেন এরূপ ক্রন্দন করিতেছেন?" মাধবেন্দ্রপুরী ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু নানা উপচারে ভোজন করেন, মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসের বিধি পালন করেন না,—এইরূপ নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহার দৈনিক আহার খুব কমাইয়া ফেলিলেন।

রামচন্দ্রপুরী বিশেষ কুটিলস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। লোককে নিজেই অনুরোধ করিয়া অধিক খাওয়াইতেন, আবার নিজেই সেই লোককে 'অত্যাহারী' বলিয়া নিন্দা করিতেন। গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর উপেক্ষার ফলে রামচন্দ্রপুরীর ভগবচ্চরণে অপরাধ করিবার স্পৃহা জাগিয়াছিল।

> গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
>
> ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥—চৈঃ চঃ অঃ ৮।৯৬

রামচন্দ্রপুরী ও অমোঘের ন্যায় চিত্তবৃত্তি আমাদের অনেকেরই আছে। আমরা অনেক সময় ভগবান্ ও মহাভাগবত বৈষ্ণবকেও

কাম-ক্রোধ-লোভের অধীন সাধক জীবের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহাদের আহার-বিহারাদির নিন্দা করিয়া থাকি। শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলাদ্বারা আমাদের এই দুর্ব্বুদ্ধিকে শাসন করিয়াছেন।

আটষট্টি

গোপীনাথ পট্টনায়ক

ভবানন্দ রায়ের * পুত্র ও রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক তখন উড়িষ্যার রাজার অধীনে কার্য্য করিতেন। গোপীনাথ রাজকোষের কিছু অর্থ নষ্ট করায় যুবরাজ গোপীনাথের প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুকে গজপতি প্রতাপরুদ্র বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করেন, রায় রামানন্দও মহাপ্রভুর বিশেষ আদরের পাত্র,—ইহা জানিয়া কতিপয় ব্যক্তি গোপীনাথের প্রাণরক্ষার্থ রাজাকে অনুরোধ করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু, ঐরূপ বিষয়-কথায় তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই—জানাইয়া গোপীনাথকে তিরস্কার করিলেন। পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া গোপীনাথের অপরাধের জন্য সবংশে বাণীনাথ প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্তেরও রাজদ্বারে বন্ধনের কথা জানাইলে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"তোমরা কি বলিতে চাহ যে, আমি রাজার নিকট গিয়া বাণীনাথের বংশের জন্য আঁচল পাতিয়া কড়ি ভিক্ষা করিব?"

কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথকে প্রাণদণ্ডের জন্য খড়্গের উপরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে—এইরূপ সংবাদ আসিল। মহাপ্রভুকে এই কথা

* ভবানন্দরায়ের পাঁচজন পুত্র—(১) রামানন্দরায়, (২) গোপীনাথ পট্টনায়ক, (৩) কলানিধি, (৪)সুধানিধি এবং (৫)বাণীনাথ। ইঁহারা উৎকলের করণ-বংশে আবির্ভূত হন।

জানাইলেও তিনি বলিলেন—"আমি ভিক্ষুক ব্যক্তি, আমি কি করিব? তোমরা এই কথা শ্রীজগন্নাথকে জানাও।"

এদিকে হরিচন্দন মহাপাত্র মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট গিয়া গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা করিলে প্রতাপরুদ্র বলিলেন যে, তিনি এই সকল কথা কিছুই শুনেন নাই। যাহাতে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়, তজ্জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে হরিচন্দন যুবরাজকে বলিয়া গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রভু বাণীনাথের রাজদণ্ডের সংবাদ-দাতাকে বাণীনাথের তৎকালের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, যখন বাণীনাথকে রাজদ্বারে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন বাণীনাথ দুই হস্তের করে সংখ্যা রাখিয়া নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সম্বন্ধে গোপীনাথকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করিলেন। গোপীনাথও তাঁহার ভ্রাতা রামানন্দ ও বাণীনাথের ন্যায় যাহাতে নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন, তজ্জন্য মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু গোপীনাথকে রাজার প্রতি কর্ত্তব্য পালন ও সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সদ্ব্যয় করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। *

উনসত্তর

"রাঘবের ঝালি," "বেড়া-কীর্ত্তন", গোবিন্দের "সেবা-নিয়ম"

গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় পুরী আসিলেন। পাণিহাটির রাঘব পণ্ডিত তাঁহার ভগ্নী

* চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৪২-১৪৪

দময়ন্তীর প্রস্তুত নানাপ্রকার ' খাদ্য-দ্রব্য ঝুলি বা ঝুড়িতে ভরিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার জন্য পুরীতে লইয়া আসিলেন। তাহাই **'রাঘবের ঝালি'** নামে প্রসিদ্ধ।

একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত জগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন এবং সাতটি সম্প্রদায় রচনা করিয়া বেড়া-সংকীর্ত্তন * আরম্ভ করিলেন। সে-দিন মহাপ্রভু এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেকেই মহাপ্রভুকে তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর দেহে তখন অভূতপূর্ব্ব অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইল।

মহাপ্রভু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া প্রসাদাদি সেবনের পর গম্ভীরার † দ্বারে শয়ন করিলেন। সেবক গোবিন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর পাদসেবা ও মহাপ্রভু নিদ্রিত হইলে তাঁহার উচ্ছিষ্ট-ভোজন—ইহা গোবিন্দের প্রতি দিনকার নিয়ম ছিল।

সেই দিন মহাপ্রভু গম্ভীরার সমস্ত দরজা জুড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ পাদসম্বাহনার্থ গৃহের ভিতরে যাওয়ার পথ চাহিয়া মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে প্রভু বলিলেন,—"আমি সরিতে পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা, কর।" তখন গোবিন্দ অগত্যা নিজের বহির্ব্বাসদ্বারা মহাপ্রভুর অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন-সেবা করিতে লাগিলন। মহাপ্রভু প্রায় এক ঘণ্টাকাল নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পরে গোবিন্দকে তখনও গৃহের ভিতরে দেখিয়া ভর্ৎসনা

---

* মন্দির বা কোনস্থান বেড়িয়া (বেষ্টন করিয়া) যে নৃত্য-সংকীর্ত্তন। চৈঃ চঃ মঃ ১১।২২০-২২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† চাতাল বা বারান্দার পর দালান, উহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে গম্ভীরা বলে।

করিলেন এবং বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন,—"আপনি দ্বারে শুইয়াছেন, আমি কেমন করিয়া যাই?" মহাপ্রভু বলিলেন—"তুমি যে ভাবে আসিয়াছিলে, সেই ভাবে গেলে না কেন?" গোবিন্দ নিরুত্তর, মনে মনে বিচার করিলেন,—

* * "আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥—চৈঃ চঃ অঃ ১০। ৯৫-৯৬

সেবাই আমার মূল লক্ষ্য, সেবা করিতে গিয়া যদি আমার নরকে গমন হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু আমার নিজের ভোগের জন্য আমি অপরাধের আভাস-মাত্রকেও ভয় করি। মহাপ্রভুর সেবার প্রয়োজনেই মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এখন নিজের প্রয়োজনে কিছুতেই তাহা আর করিতে পারি না।"

সত্তর

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিকটে নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে * বাস করিয়া নিরন্তর সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেন। একদিন গোবিন্দ হরিদাসের নিকট মহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া দেখিলেন,— ঠাকুর হরিদাস শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং অতি আস্তে আস্তে সংখ্যা সংকীর্ত্তন করিতেছেন। হরিদাস মহাপ্রসাদের একটি কণা-মাত্র সম্মান করিলেন। আর একদিন মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া হরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস বলিলেন,—

শরীর স্বস্থ হয় মোর, অস্বস্থ বুদ্ধি-মন॥ —চৈঃ চঃ অঃ ১১।১২

* ঐ স্থান 'সিদ্ধবকুল'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে?" হরিদাস উত্তর করিলেন,—"আমার সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন পূর্ণ হইতেছে না, ইহাই আমার ব্যাধি।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার সিদ্ধদেহ, সুতরাং ঐরূপ সাধনের অভিনয়ে আগ্রহের কি প্রয়োজন?"

হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট অনেক দৈন্য করিলেন এবং তাঁহার একটি বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের একান্ত সাধ—তিনি মহাপ্রভুর চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ এবং তাঁহার চন্দ্রবদন দু'নয়নে দর্শন করিয়া মুখে 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হন। কারণ, তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিবেন না।

মহাপ্রভু সেইদিন চলিয়া গেলেন এবং পরদিন প্রাতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার পর ভক্তগণকে লইয়া পুনরায় হরিদাসের নিকট আগমন করিলেন। হরিদাসের কুটীরের সম্মুখে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল—সকলে হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন সকল বৈষ্ণবের নিকট হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ হরিদাসের চরণে প্রণত হইলেন। হরিদাস সম্মুখে মহাপ্রভুকে বসাইয়া প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর চরণযুগল লইয়া নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, সমস্ত ভক্তের পদরেণু মস্তকে মাখিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মুখে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু'—এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের ভীষ্মের নির্য্যাণের ন্যায় 'মহাপ্রয়াণ' হইল। সকলে 'হরি কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া মহাসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন।

মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া ভক্তগণের

সহিত নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। হরিদাসের চিদানন্দ দেহকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"আজ হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" মহাপ্রভুর ভক্তগণ হরিদাসের পদধৌত জল পান করিলেন, হরিদাসের অঙ্গে প্রসাদী চন্দন লেপন করিলেন এবং বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ঐ দেহ বালুকার গর্ত্তে শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং 'হরিবল হরিবল' বলিতে বলিতে নিজ-হস্তে হরিদাস ঠাকুরকে সমাধিস্থ করিলেন এবং তাঁহার উপরে বালি দিয়া, তদুপরি সমাধিপীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুক্ষণ ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতে লাগিল। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের সমাধিপীঠ প্রদক্ষিণ করিলেন ও হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিলেন। "হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য আমাকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দাও"—এই বলিয়া মহাপ্রভু পসারিগণের নিকট হইতে স্বয়ং আঁচল পাতিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন।

প্রচুর প্রসাদ সংগৃহীত হইল। ঠাকুর হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবে মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ-হস্তে সকলকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন, পরে পুরী-ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রসাদ সম্মান করিলেন। ভক্তগণ আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের বিরহে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

> "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
> স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গভঙ্গ ॥" —চৈঃ চঃ অঃ ১২।৯৪

একাত্তর

পুরীদাস ও পরমেশ্বর মোদক

প্রতি বৎসরের ন্যায় গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্রও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শিবানন্দ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—'পরমানন্দ পুরীদাস' রাখিয়াছিলেন। যখন শিবানন্দ বালক পরামানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু বালকের মুখে নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। বালক সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিল। এই পরমানন্দ দাসই "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক" ও "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"র প্রসিদ্ধ রচয়িতা কবিকর্ণপূর গোস্বামী। ইঁহার রচিত "আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ" "অলঙ্কারকৌস্তভ" প্রভৃতি গ্রন্থও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি।

নবদ্বীপে বাল্যলীলা-কালে গৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুরের পরমেশ্বর মোদক-নামক এক ময়রার গৃহে দুগ্ধ-খণ্ডাদি/ মিষ্টান্নের জন্য প্রায়ই যাইতেন। সেই পরমেশ্বর মোদক এই বৎসর তাঁহার পত্নীর সহিত পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। উক্ত মোদক মহাপ্রভুর বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে মুকুন্দের মাতাও (নিজ-পত্নী) আসিয়াছে। সন্ন্যাসীর আদর্শ-প্রদর্শনকারী লোকশিক্ষক মহাপ্রভু মুকুন্দের মাতার নাম শুনিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু সরল গ্রাম্যস্বভাব মোদককে কিছু বলিলেন না।

বায়াত্তর

পণ্ডিত জগদানন্দ

জগদানন্দ শিবানন্দসেনের বাড়ী হইতে এক কলসী সুগন্ধি চন্দনাদি-তৈল বহু যত্নের সহিত আনিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য গোবিন্দের

হস্তে প্রদান করিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন,—'একে ত' সন্ন্যাসীর তৈলমাত্রে অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল! এই তৈল শ্রীজগন্নাথের সেবায় দাও, উহাতে তাঁহার প্রদীপ জ্বলিবে। আর জগদানন্দের পরিশ্রমও সফল হইবে।"

দশদিন পরে আবার গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জগদানন্দের অনুরোধ জানাইলে মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"যখন জগদানন্দ তৈল দিয়াছে, তখন একজন মর্দ্দনিয়াও দরকার। এই সুখের জন্যই ত' সন্ন্যাস করিয়াছি! আমার সর্ব্বনাশ, আর তোমাদের পরিহাস! পথে চলিবার কালে যখন লোকে তৈলের গন্ধ পাইবে, তখন আমাকে 'দারি-সন্ন্যাসী' বলিয়া স্থির করিবে।"

পণ্ডিত জগদানন্দ গোবিন্দের মুখে মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া প্রণয়াভিমানরোষে মহাপ্রভুর সম্মুখেই তৈলভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে শুইয়া রহিলেন। ভক্তপ্রেমবশ মহাপ্রভু ভক্তের মানভঙ্গ করিবার জন্য তৃতীয় দিবসে জগদানন্দের গৃহে গেলেন এবং স্বয়ং উপযাচক হইয়া পণ্ডিতের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন ও পণ্ডিতকে প্রসাদ সেবন করাইলেন।

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণের দ্বারা সকল বস্তুর একমাত্র মালিক পরমেশ্বরেরই স্বারসিকী* সেবা করিতে হইবে। সাধক নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করিয়া আদর্শ জীবন-

* স্বারসিকী—স্ব=নিজ, রসের অনুযায়ী সেবা। অর্থাৎ নিজের যে যে জিনিষ ভোগ করিতে রুচি হয়, সেই সকল জিনিষ নিজে ভোগ না করিয়া তাহা ভগবানকে ভোগ দিয়া তাঁহার সেবা করা।

যাপনপূর্ব্বক হরিসেবা করিবেন। তিনি কখনও ভগবানের ভোগের বা মহাভাগবতের চেষ্টার অনুকরণ করিবেন না।

কৃষ্ণ-বিরহানলে মহাপ্রভুর দেহ সর্ব্বদা তপ্ত থাকিত বলিয়া তিনি কলার খোলে শয়ন করিতেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বৈরাগ্যের আচরণ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা হইত। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্য গেরুয়া ওয়াড় দিয়া তোষক-বালিশ তৈয়ার করাইলেন। মহাপ্রভু কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। অবশেষে স্বরূপ গোস্বামী শুষ্ক কলাপাতা নখে চিরিয়া চিরিয়া তাহা বহির্ব্বাসের মধ্যে ভরিয়া তোষক বালিশ করিয়া দিলেন। অনেক চেষ্টার পর মহাপ্রভু তাহা ব্যবহারে স্বীকৃত হইলেন। এই লীলার দ্বারাও মহাপ্রভু সাধক-সন্ন্যাসিগণকে বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

তিয়াত্তর

দেবদাসীর 'গীতগোবিন্দ'-গান

একদিন মহাপ্রভু দূর হইতে 'গীতগোবিন্দে'র একটি পদ গান শুনিতে পাইলেন। স্ত্রী কি পুরুষ, কে গান করিতেছে,—তাহা না বুঝিতেই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে আত্মহারা ও অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া কাঁটাবনের মধ্য দিয়া গায়িকা দেবদাসীর দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অবরোধ করিয়া উহা 'স্ত্রীলোকের গান' বলিয়া জানাইলেন। 'স্ত্রী'-নাম শুনিবামাত্র মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং বলিলেন,—

—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার। —চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫,৮৬

মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণের ছলে রমণীর মধুর কণ্ঠ ও রূপ উপভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন পিপাসা—যাহা ভবিষ্যতে সহজিয়া-সম্প্রদায়ে সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন। কৃষ্ণগান শ্রবণের ছলনা করিয়া সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রীলোকের গান শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। সাধক জীব এই বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকিবেন।

চুয়াত্তর

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে পুরুষোত্তমে আসিবার সময় রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক রামানন্দি-সম্প্রদায়ের পাণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রামদাসের অন্তরে মুক্তির পিপাসা ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ছিল, তাই মহাপ্রভু রামদাসের বাহ্য-দৈন্য ও বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া পরম বৈষ্ণব তপনমিশ্রের ও মিশ্র-সহধর্ম্মিণীর সেবার জন্য পুনরায় কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্রের পরমার্থে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে তাঁহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ চরণপ্রান্তে আনিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ ভট্টের বৃদ্ধ মাতাপিতা ভগবানের একান্ত সেবক-সেবিকা ছিলেন। তাই মহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার অন্তর্ধানের পর নীলাচলে আসিবার আদেশ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। রঘুনাথ ভট্ট মাতা-পিতার কৃষ্ণপ্রাপ্তির পর নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে নিজের কাছে আটমাস-কাল

রাখিবার পর বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ ভাগবত পাঠ ও কৃষ্ণনাম করিতে আদেশ করিলেন।

মহাপ্রভুর এই কার্য্যে একটি শিক্ষা এই,—যে ব্যক্তি সংসারে প্রবিষ্ট হয় নাই, অথচ তাহার হৃদয়ে হরিভজনের প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে সংসারী হইবার প্ররোচনা দিলে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতাই করা হয়। আবার বৈষ্ণব মাতা পিতার সেবার সুযোগের ছলনায় নূতন করিয়া সংসার পত্তন বা ভোগময় সংসারে প্রবেশের যে প্রচ্ছন্ন ভোগবৃত্তি মানবের হৃদয়ে আছে, তাহাও মহাপ্রভু (শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া) নিবারণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। এক বৃদ্ধা উড়িয়া স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর স্কন্ধের উপর পদস্থাপন করিয়া মহাব্যাকুলতার সহিত জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোকটিকে নিবারণ করিলে মহাপ্রভু স্ত্রীলোকটির আর্ত্তির প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—"আহা! স্ত্রীলোকটির কি আর্ত্তি! জগন্নাথের জন্য আমার ত' এইরূপ ব্যাকুলতা হয় না। ইঁহার দেহ-মন-প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট।"

পঁচাত্তর

দিব্যোন্মাদ

গৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রিতে তিনি স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ করিতে করিতে কত ভাবেই না কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেন। এক রাত্রিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার শয়ন-কক্ষের তিনটি দ্বারই বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রিতে প্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া গোবিন্দ ও স্বরূপের সন্দেহ হইল। কোন প্রকারে দ্বার খুলিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন —সমস্ত ঘরের দ্বার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভু ঘরে নাই। স্বরূপাদি ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাপ্রভুকে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহ-দ্বারের উত্তরে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুর জ্ঞান হইল। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ চটক পর্ব্বত * দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞান হইল। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের সম্বন্ধে ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে বায়ুবেগে পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীরাধার দাসী অভিমানে নিজের ভাবাবস্থাসমূহ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে মহাপ্রভু রাত্রিদিন কৃষ্ণবিরহে প্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন। কখনও অন্তর্দ্দশা, কখনও অর্দ্ধবাহ্য-দশা, কখনও বা বাহ্য-স্ফূর্ত্তি। কেবল স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে স্নান, দর্শন, ভোজন প্রভৃতি করিতেন। তিনি মহাভাবে স্বরূপ-রামানন্দের গলা ধরিয়া কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করিতেন। আপনাকে গোপীর দাসী অভিমান করিয়া ও

---

* গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে যে বালির পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ স্তূপ আছে, তাহা 'চটক পর্ব্বত' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এ বৎসর এই স্থানে ব্যাসপূজার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থানে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবা প্রকাশিত হইয়াছে।

পুষ্পোদ্যানকে বৃন্দাবন জ্ঞান করিয়া তথায় প্রবেশ করিতেন এবং তরু-লতা-গুল্ম-মৃগ-সমূহকে কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন।

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিবার সময় জগন্নাথকে শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন করিতেন, কখনও বা মহাভাবাবেশে মন্দিরের দ্বার-রক্ষকের হাত ধরিয়া বলিতেন,—"আমাকে প্রাণনাথ কৃষ্ণ দেখাও।"

একদিন পাণ্ডাগণ মহাপ্রভুকে জগন্নাথের বাল্যভোগ-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক হইল ও নয়নে অশ্রুধারা বহিতে থাকিল। ঐ প্রসাদে কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে—এই স্মৃতি জাগিতেই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণের অধরের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের অধরের জন্য রাধা ও গোপীগণের যে উৎকণ্ঠা, তাহা মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হইল।

আর একদিন মধ্যরাত্রে মহাপ্রভু প্রবল প্রেমোন্মাদে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াই তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাহির হইয়া গিয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গী * গাভীগণের মধ্যে কূর্ম্মাকারে অচেতনভাবে পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণের উচ্চ নামকীর্ত্তন-শ্রবণে অনেকক্ষণ পরে তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যদশা হইলে তিনি স্বরূপ গোস্বামীর নিকট নিজের অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করিলেন।

একদিন শরৎকালের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে মহাপ্রভু রাসলীলার স্মৃতিতে বিভাবিত হইয়া ভক্তগণের সহিত বেড়াইতেছিলেন। তখন আইটোটা (বাগান) হইতে হঠাৎ সমুদ্র দর্শন হইবামাত্র তাঁহার যমুনার স্মৃতি

---

* কর্ণাটের পূর্ব্ব ও দ্রাবিড়ের পূর্ব্বোত্তরস্থিত দেশকে তৈলঙ্গদেশ বলে। এই স্থানের গাভীকে 'তৈলঙ্গী গাভী' বলে।

উদিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং মূর্চ্ছিতাবস্থায় ডুবিয়া ভাসিয়া কোণারকের * দিকে চলিলেন। যমুনাতে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের জলকেলির ভাবে তাঁহার অন্তর বিভাবিত। এক ধীবর জালে বড় মাছ পড়িয়াছে মনে করিয়া জাল টানিয়া তাঁহাকে অচৈতন্যাবস্থায় তীরে উঠাইল। প্রভুকে স্পর্শ করিবামাত্রেই ধীবরের প্রেমাবেশ হইল। মৃতস্পর্শে ভূতগ্রস্ত হইয়াছে মনে করিয়া ধীবর ওঝার সন্ধানে যাইতেছিল। স্বরূপ গোস্বামি-প্রমুখ ভক্তগণ মহাপ্রভুর অন্বেষণে তীরে তীরে আসিতে আসিতে উক্ত ধীবরকে ঐরূপ প্রেমপুলকিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ধীবরই মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছে জানিয়া ব্যাকুলিত-চিত্তে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। তাঁহারা মহাপ্রভুর মুখে মহাভাবের কথাসমূহ শ্রবণ করিয়া মহা-প্রভুকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

ছিয়াত্তর

কালিদাস ও ঝড়ু ঠাকুর

কালিদাস নামে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর এক জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধন ও সাধ্য ছিল। মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়দেশ হইতে যত বৈষ্ণব পুরীতে আসিতেন, কালিদাস তাঁহাদের সকলেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। বৈষ্ণব দেখিলেই তিনি তাঁহার নিকট উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য ভেট লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের

* চৈঃ চঃ অঃ ১৮।৩১, ৬

ভোজনের অবশেষ চাহিয়া লইতেন। বৈষ্ণবে কোনরূপ জাতিবুদ্ধি করিতে নাই—ইহার উজ্জ্বল আদর্শ কালিদাস স্বীয় জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

মহাপ্রভুর ভক্ত ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস একদিন কিছু আম ভেট লইয়া ঝড়ু ঠাকুরের নিকট গেলেন এবং ঝড়ু ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসকে অভ্যর্থনা করিয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কালিদাস বুঝিতে পারিলেন,—ঝড়ু ঠাকুর দৈন্য করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের পদধূলি প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার চরণ নিজ মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় ঝড়ু-ঠাকুর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কালিদাসের অনুগমন করিয়াছিলেন। ঝড়ু ঠাকুর গৃহে ফিরিয়া গেলে কালিদাস পথের উপর ঝড়ু ঠাকুরের যে চরণ-চিহ্ন পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন এবং ঝড়ু ঠাকুর দেখিতে না পান—এরূপ একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে ঝড়ু ঠাকুর মনে মনেই ভগবানকে আমগুলি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী ঝড়ু ঠাকুরের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া আমের খোসা ও চোষা আটিগুলি বাহিরে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন।

কালিদাস এতক্ষণ লুকাইয়াছিলেন। তিনি উচ্ছিষ্টগর্ত্ত হইতে সেই আমের খোসা ও চোষা আঁটিগুলি সংগ্রহ করিয়া চুষিতে চুষিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন।

মহাপ্রভু যখন মন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন সিংহদ্বারের

নিকটে সিঁড়ির নীচে একটি গর্ত্তমধ্যে পদ ধৌত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। তিনি গোবিন্দকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার সেই পদধৌত জল কোনরূপে গ্রহণ করিতে না পারে। দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত কেহই সেই জল লইতে পারিত না। এক দিন মহাপ্রভু পদ ধৌত করিবার সময় কালিদাস তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দের নিকট হইতে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট চাহিয়া লইয়া ভোজন করিতেন।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম **মহাপ্রসাদ**, আর সেই মহাপ্রসাদ যখন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত আস্বাদন করিয়া অবশেষ রাখেন, তখন তাহাকে **মহা-মহাপ্রসাদ** বলে। ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তের ভুক্তাবশেষ—এই তিনটি সাধনের বল। এই তিন হইতে কৃষ্ণে প্রেম লভ্য হয়। এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ঠ কালিদাস এই তিন বস্তুকেই সাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন।

শিবানন্দ সেনের সাত বৎসর-বয়স্ক পুত্র পরমানন্দ পুরীদাস মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ শিশু-বয়সেই অপ্রাকৃত কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সাতাত্তর

লীলা সঙ্গোপনের ইঙ্গিত

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিবৎসর বাৎসল্যরস-মূর্ত্তি শচীমাতাকে আশ্বাস দিবার জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইতেন। পরমানন্দপুরীর অনুরোধে মহাপ্রভু শচীদেবীর জন্য নবদ্বীপে বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ভক্তগণের জন্যও মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন।

একবার জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইয়া যখন পুরীতে

আসিলেন, তখন অদ্বৈতপ্রভু জগদানন্দের দ্বারা মহাপ্রভুর নিকট হেঁয়ালিচ্ছলে এইরূপ কএকটি কথা বলিয়া পাঠাইলেন,—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।*
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল ॥ †
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥—চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২০,২১

অর্থাৎ প্রেমোন্মত্তকে (মহাপ্রভুকে) বলিও, লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেমের হাটে প্রেমরূপ-চাউল বিক্রয়ের আর স্থান নাই। তাঁহাকে বলিও,—আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। পাগলকে বলিও যে, পাগল বা প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত এইরূপ বলিয়াছে। অর্থাৎ, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন প্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।

এই তর্জ্জা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন, "আচার্য্যের যে আজ্ঞা" বলিয়া মৌন হইলেন। স্বরূপগোস্বামী প্রভু এই তর্জ্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু সঙ্কেতমাত্র করিয়া বলিলেন,—

* * আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন ॥
পূজা-নির্ব্বাহন হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন। —চৈঃ চঃ অঃ ১৯ পঃ

মহাপ্রভু ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই গঙ্গাতীরে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা পূজা করিয়া মহাপ্রভুকে গোলোক হইতে আবাহন করিয়াছিলেন। পূজা নির্ব্বাহ করিয়া পূজক যেরূপ

* বাউল—বাতুল-শব্দের অপভ্রংশ।

† আউল—আকুল বা আতুর শব্দের অপভ্রংশ।

দেবতা বিসর্জ্জন করেন, বোধ হয়, অদ্বৈতাচার্য্য এখন সেইরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আচার্য্যের এই হেঁয়ালি পাঠ করিবার পর হইতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহদশা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিরহোন্মাদে মহাপ্রভু রাত্রিতে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘষিতেন। স্বরূপ-রামরায় সময়োচিত গানের দ্বারা মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-সমুদ্র নানা বৈচিত্র্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

একদিন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিকালে মহাপ্রভু 'জগন্নাথবল্লভ' * উদ্যানে মহাভাবাবেশে দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিলেন। দৈন্য, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় মহাপ্রভু কখনও কখনও স্বরূপ-রামানন্দের সহিত তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতেন। কখনও বা 'গীতগোবিন্দ', 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' (রামানন্দরায়ের কৃত), কখনও বা শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ-মহাভাব-সাগর নবনবায়মানভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত।

এই সকল অপ্রাকৃত মহাভাবের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা ও প্রিয়তমা একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা জগতের অভিনিবেশ বা শুষ্কবৈরাগ্যের সামান্য সম্বল লইয়া ব্যবসায় করেন, এই সকল উচ্চকথা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না। এমন কি, যাঁহাদের চিত্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, তাঁহারাও শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। শ্রীরাধার

---

* জগন্নাথবল্লভ—গুণ্ডিচা বাড়ী ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি স্থলে 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নামক একটি উদ্যান আছে।

আদর্শ সেবা-রাজ্যের চরম সীমা। সেই সেবার পরাকাষ্ঠা—প্রেমের পরাকাষ্ঠাকে রূপ দিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

পূর্ণতমভাবে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়াও কৃষ্ণের সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না, কিরূপভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব,—এজন্য যে সর্ব্বক্ষণ প্রবলোৎকণ্ঠা, তাহাকেই 'বিপ্রলম্ভ' বা কৃষ্ণবিরহ বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উচ্চ ভজনের কথাই জগতে বিতরণ করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে আর কখনও বিতরিত হয় নাই।

এই প্রকারে মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ-লীলাভিনয়, দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সন্ন্যাসি-শিরোমণি আচার্য্যের লীলায় সমগ্র ভারতে শুদ্ধভক্তি প্রচার, শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্য-লীলাভিনয় এবং সর্ব্বশেষ বার বৎসর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত সর্ব্বক্ষণ রসাস্বাদন-লীলা করিয়া আটচল্লিশ বৎসরকাল প্রকটলীলা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভক্তগণকে অধিকতর বিরহে ও কৃষ্ণভজনে উন্মত্ত করিবার জন্য স্বীয় প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর বিরহব্যথিত হইয়া গাহিয়াছেন,—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্॥

(স্তবমালা—শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়াষ্টক)

সমুদ্রতীরে উপবনসমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ বৃন্দাবনস্মৃতিতে যিনি প্রেমবিবশ হইতেন, কখনও বা অবিরাম কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দু'নয়নের গোচরীভূত হইবেন?

আটাত্তর

অপ্রকট-লীলা

অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলাকে সাধারণ মনুষ্যের দেহ-ত্যাগের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিতে চাহেন! যোগিগণের দেহ সাধারণের অলক্ষিতভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। আর যে শ্রীচৈতন্যদেব যোগেশ্বরগণেরও পরমেশ্বর, ভক্তিযোগিগণের নিত্য ধ্যানের বস্তু, তাঁহার সচ্চিদানন্দ তনু কি প্রকারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহাপ্রভু প্রকটলীলা-কালেও বহুবার বহুস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা অচিন্ত্য-শক্তি ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে। যিনি সাত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একই সময়ে নৃত্য-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা বলাইয়াছিলেন, যিনি বিসূচিকা-ব্যাধিতে মৃতপ্রায় অমোঘকে স্পর্শমাত্র রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন, যিনি প্রবল তরঙ্গে আলোড়িত সমুদ্রের মধ্যে মহাভাব-মূর্চ্ছায় সারারাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন, যে কৃপালু ভগবান্ গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সুপুরুষ ও কৃষ্ণপ্রেমিক করিয়াছিলেন, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য-প্রকটনকারী ভগবানের সশরীরে অদৃশ্য হওয়া বা একই সময় বহু স্থানে দৃশ্য হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদবতারগণেরও সশরীরে বৈকুণ্ঠবিজয়ের কথা ভারতবর্ষে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ব্যাপার।

> লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
> যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধা ধামাবিশৎ স্বকম্॥—ভাঃ ১১।৩১।৬

স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ নিজ দেহকে আগ্নেয়ী-যোগধারণাদ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন। পরন্তু ভগবানের অন্তর্দ্ধান সেরূপ নহে, ভগবান্ নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দ-তনু দগ্ধ না করিয়াই ঐ শরীরের সহিতই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের অবস্থান; সুতরাং সর্ব্ব জগতের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

অজাতো জাতবদ্ বিষ্ণুরমৃতো মৃতবত্তথা।
মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ॥—ব্রাহ্মে

ভগবান্ বিষ্ণু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত মায়াবলে অজাত হইয়াও জাত জীবের ন্যায় এবং অমৃত হইয়াও মৃত জীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।

উনআশী

শ্রীচৈতন্যের গ্রন্থ ও তাঁহার শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র রচনা করাইয়াছেন। যে যে ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে হইবে, তাহার সূত্র-সমূহ তিনি কাশীতে অবস্থান-কালে সনাতনকে লেখাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতনের রচিত "বৃহদ্ভাগবতামৃত", "বৈষ্ণবতোষণী" গ্রন্থ মহাপ্রভুরই রচনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরূপের রচিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু", "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থও তদ্রূপ। মহাপ্রভু প্রয়াগে ঐ সকল গ্রন্থের সূত্র শ্রীরূপকে বলিয়াছিলেন। "ললিতমাধব", "বিদগ্ধমাধব" প্রভৃতি নাটক ও শ্রীরূপ-সনাতনের কতিপয় রচনা মহাপ্রভু স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপ্রভুর প্রদত্ত সূত্র অবলম্বন করিয়াই।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরচিত আটটী শ্লোক—যাহা **"শিক্ষাষ্টক"** নামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে তাঁহার শিক্ষার সার নিহিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্বরচিত আরও কতিপয় শ্লোক রূপগোস্বামি-প্রভু তাঁহার পদ্যাবলী গ্রন্থে চয়ন করিয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ আদি-কেশবের মন্দির হইতে "ব্রহ্মসংহিতা" ও কৃষ্ণবেন্বার তীর হইতে "কৃষ্ণকর্ণামৃত"—এই গ্রন্থ দুইটী আনয়ন করিয়া সেই গ্রন্থদ্বয়দ্বারা তাঁহার প্রচার্য্য তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও রসসিদ্ধান্ত-বিচার জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকে এই কয়টী বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

১। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ সম্পূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, ভীষণ সংসার-দাবানল হেলায় সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মমঙ্গল পূর্ণবিকসিত হয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পরা বিদ্যা বা ভক্তির জীবনস্বরূপ, কৃষ্ণকীর্ত্তন—প্রেমানন্দের সংবর্দ্ধন-কারী। কৃষ্ণকীর্ত্তন—পদে পদেই পরিপূর্ণ অমৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই জীবগণ সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারে।

২। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। নামী ভগবান্ নিজ নামে সর্ব্বশক্তি প্রদান করিয়া তাহা জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, নাম-কীর্ত্তনে কালাকাল, স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্র বিচার নাই। কিন্তু দুর্দ্দৈব অর্থাৎ অপরাধ থাকিলে নামে রুচি হয় না। সেই অপরাধ দশ প্রকার, তন্মধ্যে প্রকৃত সাধুর নিন্দাই প্রথম অপরাধ।*

৩। তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, নিজে অমানী ও অপরে মানদানকারী হইয়া **সর্ব্বক্ষণ** হরিনাম **কীর্ত্তন** করিতে হইবে।

---

* নামাপরাধের সম্পূর্ণ তালিকা পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

"তৃণাদপি সুনীচ" বাক্যের অর্থ এই যে, জীব এই জড়জগতের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে; বস্তুতঃ জীব—অপ্রাকৃত অণুচৈতন্য।

৪। হরিকীর্ত্তনকারী হরিনামের নিকট ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, জাগতিক কবিত্ব বা বিদ্যা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিবেন না। অধিক কি,—পুনর্জ্জন্ম হইতেও মুক্তি চাহিবেন না। প্রতিজন্মে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কামনা করিলে কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে না।

৫। জীব নিজ-স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলিকণাসদৃশ জানিয়া সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে।

৬। নাম গ্রহণ করিতে করিতে সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-সমূহ স্বতঃই অঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

৭। সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত নিমেষকালও যুগের ন্যায় মনে হইবে। অন্তরের অকৃত্রিম সেবা-ব্যাকুলতা-জনিত অশ্রু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, কৃষ্ণসেবার ব্যাকুলতায় সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইবে, অর্থাৎ জগদ্‌ভোগের পিপাসার পরিবর্ত্তে সকল বস্তুর দ্বারা কেবল কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতা হইবে।

৮। কৃষ্ণ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় যদি দেখা দেন—ভাল। আর যদি দেখা না দিয়া মর্ম্মাহত করেন, তথাপি সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অব্যভিচারিণী সেবা-লাভের আশাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র কৃষ্ণই যথাসর্ব্বস্ব।

শ্রীচৈতন্যদেব দশটী সিদ্ধান্ত জগতে জানাইয়াছেন। এই সকলই তাঁহার শিক্ষার মূল সূত্র।

১। আম্নায়-বাক্যই (বেদ) প্রধান প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদকল্পতরুর প্রপক্ব ফল এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। (২) কৃষ্ণই

পরমতত্ত্ব। (৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। (৪) তিনি সমস্ত রসামৃতের সমুদ্র। (৫) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্ন অণু অংশ। (৬) জীব তটস্থা-শক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া মায়াদ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য। (৭) তটস্থধর্ম্মবশতঃই জীব আবার মায়া হইতে মুক্ত হইবারও যোগ্য। (৮) জীব ও জড়—সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। (৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন। (১০) কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বা সাধ্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পর॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য; অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলাধাম; অপ্রাকৃত ব্রজবধূগণ কৃষ্ণের যে সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা; শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বদোষশূন্য প্রমাণ-শাস্ত্র; শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং এই শিক্ষাতেই আমাদের পরম আদর।

ভাগবত-পরম্পরা

- শ্রীকৃষ্ণ
  - ব্রহ্মা
    - নারদ
      - ব্যাস
        - শুক
        - মধ্বাচার্য্য
          - পদ্মনাভ
          - নৃহরি
          - মাধব
            - অক্ষোভ্য
              - জয়তীর্থ
                - জ্ঞানসিন্ধু
                  - দয়ানিধি
                    - বিদ্যানিধি
                      - রাজেন্দ্র
                        - জয়ধর্ম্ম
                          - পুরুষোত্তম
                            - ব্রহ্মণ্য
                              - ব্যাস
                                - লক্ষ্মীপতি
                                  - মাধবেন্দ্রপুরী
                                    - নিত্যানন্দ
                                    - ঈশ্বরপুরী
                                      - শ্রীচৈতন্য
                                    - অদ্বৈত

বিষয়-সূচী

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপের মানচিত্র
১৯১৬ সালের কৃষ্ণনগর থানার
সরকারী নক্সা হইতে প্রস্তুত
স্কেল ১ইঞ্চি - ২মাইল
উ
প
পূ
দ
তাতলা
সুজনপুর বা জলকর পালিতা
পালিতা
দীপচাঁদ পুর
ধুবুলিয়া ষ্টেশন
ধুবুলিয়া
বেলগাঁ
বেলপুকুর
দুর্গাবাস
চর
দলুইমলা
সোনডাঙ্গা
চৌগাছা
হাঁসাডাঙ্গা
মেদিয়া বা বনগ্রাম
কাঠালিয়ামাঠ
পূর্ব্বস্থলী
চুপি
ভাগীরথী নদী
কৃষ্ণনগর বা করিয়াটী
টোটা
মোল্লাপাড়া
সাহেবনগর
মায়াকোল
পারুলিয়া
একডালা
শঙ্করপুর
চরনিদয়া ও রুদ্রপাড়া
শ্রীমায়াপুর
রুইপুকুর
শ্যামনগর
পার মেদিয়া
খড়িয়া নদী
মাউগাছি
বেতপুকুর
মঙ্গলপুর
তেওরখালি
গাদিগাছা
হরিশপুর
সুবর্ণবিহার
দেপাড়া
কৃষ্ণনগর রোড ষ্টেশন
নৃসিংহদেবের মন্দির
নবদ্বীপ বা সহর নদিয়া, সহর কাসিমপুর, ওসমানপুর
শ্রীকোল
শ্রীরামপুর
চানপুর
কোবলা
সাপুর
বামনপুরা
পানশীলা
রাউতড়া
কুঁদপাড়া
মণিপোতা
চাঁপাহাটী
সমুদ্রগড়
মহীশুঁড়া
জালুহাটী
জালুই ডাঙ্গা
দিঘনগর
ঘোলগাছি
সরডাঙ্গা
বালিয়াডাঙ্গা
গোয়ালপাড়া
চক পানশীলা
বোয়ালিয়াডহর
শ্রী অন্নদা প্রসাদ দত্ত
উকীল কৃষ্ণনগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
page 24A